# ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ঘরে-বাইরে

- ১ -

**৬.১. গোড়ার কথা -**

*ঘরে-বাইরে* 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩২৩ সালে (১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ)। সমসাময়িক রচনা *চতুরঙ্গ*র মত *ঘরে-বাইরে*ও বিতর্কজটিল উপন্যাস। তবে *চতুরঙ্গ*র মতো আঙ্গিক বা শিল্পমূল্য বিবেচনাবিষয়ক বিতর্ক *ঘরে-বাইরে*র ক্ষেত্রে খুব একটা দেখা যায় নি। *ঘরে-বাইরে*র বিতর্কের কারণ এতে প্রতিফলিত 'রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতিভাবনা'। যে বিতর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বিভিন্ন সময় কলম ধরতে হয়েছে। এছাড়াও *ঘরে-বাইরে*র অন্ততঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে।

**এক.** রবীন্দ্র উপন্যাসে গল্পকাল এখানেই প্রথম বিশ শতকের চৌহদ্দিতে পূর্ণ প্রবেশ করেছে। চতুরঙ্গের ঘটনাকাল উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকে গড়িয়ে এলেও তা জগমোহনের ছায়ায় আবিল থাকায়, জগমোহনের কালই যেন নিয়ন্ত্রক ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়া স্থান-কালের স্পষ্টতাজ্ঞাপক বিবরণ রবীন্দ্রনাথ যে সচেতনভাবেই বর্জন করেছেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে চতুরঙ্গের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। *ঘরে-বাইরে*র গল্পকাল স্বদেশী যুগের, ১৯০৫ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ যার পরিধি। নিখিলেশের বয়স তখন ছিল প্রায় ত্রিশ ('আমার মাষ্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার এই জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দেখলুম' - নিখিলেশের আত্মকথা - প্রথম পর্যায়)। তার বন্ধু সন্দীপের বয়স সাতাশ ('আমার তো এই সাতাশ হইল' - বিমলার আত্মকথা - প্রথম পর্যায়)। অর্থাৎ উনিশ শতকের উপান্তেই এরা যৌবনে পদার্পণ করেছে। গল্পকালে বিমলার বিবাহিত জীবন ৯ বৎসর অতিক্রান্ত। তবুও উপন্যাসে কোথাও উনিশ শতকী ভাবনার ছায়া পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'নতুন কাল', উপন্যাসের সর্বত্রই তার আধিপত্য। নিখিলেশের

উপলব্ধিতে এই মডার্নিটির চরিত্রলক্ষণ স্পষ্টোচ্চারিত - "আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিসকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে, এমনিভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ পদার্থটি কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিংবা জীবতত্ত্ব, কিংবা মনস্তত্ত্ব, কিংবা বড়োজোর সমাজতত্ত্ব। কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব তত্ত্বকে নিয়ে সব তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে, দোহাই তোমাদের, সে কথা ভুলো না।" (সন্দীপের আত্মকথা - দ্বিতীয় পর্যায়) মডার্ন কাল মানুষ সম্পর্কে এই সত্য থেকে বঞ্চিত। বিমলাও উপলব্ধি করেছে 'আমার স্বামী একেবারে একেলে' (বিমলার আত্মকথা - প্রথম পর্যায়)।

**দুই.** *ঘরে-বাইরেই* রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস, যার প্রেক্ষাপট কলকাতা নয়, গ্রাম-বাংলার ভূমিনির্ভর জীবন পরিবেশ। যেখানে হরিশ কুণ্ডুরাই শেষ কথা। যেখানে পঞ্চুর জীবনধারা 'ভদ্র সমাজ, শিক্ষিত সমাজ ও কলিকাতা সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ' (গোরা, পরিচ্ছেদ - ২৬) তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যেখানে সন্দীপের মতো 'শহুরে বাবু'রা 'স্বদেশী ফিরি' করতে যায়।

**তিন.** *ঘরে-বাইরেই* চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি যেহেতু তিনটি চরিত্রের ডায়েরির মধ্যদিয়ে বিবৃত, আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে আপন গূঢ় সত্তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাদের প্রকাশভঙ্গি সহজ চলিত ভাষাকেই আশ্রয় করেছে। সবুজপত্রের যুগে সাধুভাষা ও চলিত ভাষা নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাতে চলিত ভাষাবাদীদের পক্ষ নিয়েছিলেন। 'ঘরে-বাইরে লিখে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, চলতি ভাষায় পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা করাও সম্ভব। বন্ধনমুক্ত চলতি ভাষার উল্লসিত আত্মপ্রকাশের সঙ্গে এই ভাষাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার সচেষ্ট আকাঙ্খাও ছিল'।[১] ভাষার এই বন্ধনমুক্তি বা বন্ধনমুক্ত ভাষা এক্ষেত্রে উপন্যাসটির মৌল আধেয় বন্ধনমুক্ত নারীর বা নারীর বন্ধনমুক্তির উপযুক্ত আধার হয়ে উঠেছে।

### ৬.১.১. বিতর্কের আবর্তে ঘরে-বাইরে -

স্বদেশী আন্দোলন এবং তৎকালীন রাজনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব, যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে ব্যক্ত, রবীন্দ্রনাথের সেই রাজনৈতিক চেতনাপুঞ্জ *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে শিল্পরূপ পাওয়ায় ঘরে-বাইরে কেন্দ্রিক বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শও সমালোচিত হয়েছে। এর ফলে ঘরে-বাইরে কেন্দ্রিক বিতর্ক প্রধানত তিনটি খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

**এক.** *ঘরে-বাইরে* রাজনৈতিক উপন্যাস কি না।

**দুই.** *ঘরে-বাইরেতে* প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণযোগ্য কি না।

**তিন.** *ঘরে-বাইরেতে* রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনাপুঞ্জের প্রতিফলন উপন্যাসের শিল্পসীমাকে অতিক্রম করেছে কি না।

এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় ঃ

**এক.** *ঘরে-বাইরের* মুখ্য অবলম্বন রাজনীতি বলে মনে করেছেন অনেক সমালোচক। নেপাল মজুমদার লিখেছেন,

> ‘‘ঘরে-বাইরে মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র, নিখিলেশ ও সন্দীপ দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। নিখিলেশ যেন রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র, স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশী সমাজ ও পল্লীউন্নয়নমূলক আদর্শের প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, নিখিলেশ যেন সেই রকম আদর্শে নিষ্ঠাবান বলিষ্ঠ উদারচরিত্রের নির্ভীক যুবক। অপরদিকে, সন্দীপ বাংলাদেশের তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী বা সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয়রূপে এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে।’’[২]

আবার ‘চরিত্রের মৌল সংকট’ই যে ঘরে-বাইরের মূল প্রতিপাদ্য – এমন মতও বহু সমালোচক পোষণ করেছেন, যে ধারা আজও বহমান।

> ‘‘ঘরে-বাইরে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিবৃত্ত নয়, কিংবা নয় নীতিশাস্ত্র অথবা

তত্ত্বগ্রন্থ - এ উপন্যাসের মৌল সংকট চরিত্রের। যেসব চরিত্র জীবনের বিচিত্র জিজ্ঞাসায় এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও সময়ের অভিজ্ঞতায় উজ্জীবিত - তাদের অস্তিত্বের সমস্যাই এ উপন্যাসের মুখ্য অবলম্বন।"[৩]

**দুই.** স্বদেশী যুগের উন্মাদনার দিনে এবং এরও আগে পরে রবীন্দ্রনাথ যে বিকল্প রাজনৈতিক মতাদর্শে অবিচল থেকেছেন, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন সময়। নেপাল মজুমদার তাঁর মহাগ্রন্থে অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক রাজনৈতিক ভাবনার গ্রহণযোগ্যতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি লিখেছেন -

"রবীন্দ্র-রচনাবলী পাঠকালে একথা আমার মনে হইয়াছে যে, দেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কবি যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং নিজের যে সকল পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সেই সকল রচনা ও কর্মপ্রচেষ্টার তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"[৪]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

"সদুপায় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশপ্রেমের অত্যুচ্ছাসের মধ্যে যে দুর্বলতা ছিল তাহা অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। ... নিগূঢ় তত্ত্বটি আশ্চর্য সাহস ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"[৫]

গোপাল হালদার লিখেছেন –

"ভারতীয় স্বাদেশিকতার প্রথম যুগ থেকে স্বাধীনতার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বাদেশিকতার ইতিহাসে অজস্র দান জুগিয়েছেন। সে দানও বহুবিধ - তা মহৎ ভাবনার, তা বাস্তব উদ্যোগ ও কর্মের এবং প্রাণময় সৃষ্টির। চিন্তা, কর্ম ও রসসৃষ্টি, এই তিন ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আবার সেই দান

বিচিত্র ও সহস্রমুখী।... রবীন্দ্রপ্রতিভা সৃষ্টিধর্মী, তাই স্বাদেশিকতার যে আবেগ ও উস্কীপনা সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসে সংহত ও রূপায়িত হতে চাইত না, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় তা যথার্থ বিকাশ নয়, সুস্থ ও সার্থক দেশানুরাগও নয়।"[৬]

অপরদিকে সুশোভন সরকার রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক চিন্তাকে অবাস্তব বলে মনে করে লিখেছেন,

"স্বদেশি আমলে রবীন্দ্রনাথ সরকার বা স্টেট থেকে সমাজ অর্থাৎ সোসাইটিকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাববার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমটি উর্দ্ধে স্থিত শাসক সম্প্রদায়ের শক্তি, ভারতের ইতিহাসে বারবার তার পরিবর্তন হয়েছে; দ্বিতীয়টি সঙ্ঘবদ্ধ আত্মশাসিত জনসমষ্টি, যুগ যুগান্তে তার প্রকৃতি অবিকল থেকেছে। ইংরাজ শাসনে নূতন আর্থিক ব্যবস্থায় যে এই ভেদ রেখা লুপ্ত হতে বাধ্য, মধ্যযুগের ইউরোপীয় ম্যানরের মতন ভারতীয় ভিলেজ কমিউনিটির দিনও ফুরিয়ে গেছে - এই চিন্তা তখন তাঁর মনে স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ তাই স্বদেশি সমাজকে পূনর্জীবিত করবার প্রস্তাব করলেন, এখন বোঝা সহজ তাঁর এ ধারণা কতখানি ইউটোপীয় অর্থাৎ অবাস্তব। ... সে কালের আদর্শে তপোবনাশ্রিত যে শিক্ষাপদ্ধতি তিনি একদা সমর্থন করেছিলেন, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে তার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া শক্ত।"[৭]

স্বদেশী আমলে এবং তার পরেও, এমনকি আজও সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক রবীন্দ্র-বীক্ষা বার বার সমালোচিত হলেও তাঁর গঠনমূলক চিন্তাধারার মূল্য অস্বীকৃত হয়নি একেবারে। একারণেই সুশোভন সরকার রবীন্দ্রনাথের রাষ্টনৈতিক মতের মধ্যে অবাস্তবতা দেখলেও রবীন্দ্রনাথের মত ও পরিকল্পনাকে গুরুত্বহীন জ্ঞান করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি,

"কিন্তু তবুও আমাদের অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল এবং ভবিষ্যতের উপর তার প্রভাব অসামান্য বলেই গণ্য

হবে।"[৮] এবং

"সুদীর্ঘ কর্মজীবনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে এমন অনেক কিছু শেখাতে চেয়েছিলেন যার স্মৃতি সহজে ম্লান হবেনা। সে-সব দিকেও তাঁর শক্তি জাতীয় জীবনে বিশাল পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রিক আন্দোলনে প্রথম থেকে ভিক্ষাবৃত্তির তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন; যে-আত্মশক্তির উদ্বোধন তাঁর অবিচল লক্ষ্য ছিল, পলিটিক্সে তার মূল্য অসীম। সেকালের পোলিটিকাল প্রচেষ্টার প্রধান দুর্বলতা তিনি ধরতে পেরেছিলেন - জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যথার্থ সংযোগের অভাব তাঁকে ক্রমাগত পীড়া দিত। বয়কটের উন্মাদনার মধ্যেও তাই তিনি সদুপায় প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, স্বদেশি কর্মীরা সাধারণ লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা না করেও আত্মীয়তার দাবি আনছে। চাষিদের অর্থকষ্ট যে দেশের এক গুরুতর সমস্যা, এ কথা তিনি কখনও ভোলেন নি; গ্রামসংস্কারের উদ্যম তাই তাঁকে টেনেছিল প্রথম থেকেই। বাংলাদেশের মেলার মধ্য দিয়ে সহজে কীভাবে জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, স্বদেশী সমাজ-এ কর্মীদের প্রতি তাঁর সেই উপদেশে বুঝতে পারি যে প্র্যাকটিকাল ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের একটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু যে শিক্ষার প্রকৃত বাহন হতে পারে না, পঞ্চাশ বছর আগে তিনি একথা সজোরে প্রচার করে গেছেন। একদিকে হিন্দুর সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ববাদকে তিনি বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জরিত করেছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিমের গুণমুগ্ধ হয়েও তিনি তার রাষ্ট্রসর্বস্ব চিত্তবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেছিলেন; সেই ঝোঁকই অবশ্য পরবর্তী ফ্যাসিজমের অন্যতম উপাদান।"[৯]

এখানে লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথের যে রাজনৈতিক ধারণা বার বার সমালোচিত হয়েছে, কখনো অবাস্তব বলে গৃহীতই হয়নি, অথচ যে আত্মশক্তির উদ্বোধন তাঁর অবিচল লক্ষ্য ছিল, পলিটিক্সে তার মূল্য অসীম বলে পরবর্তীতে মূল্যায়িত হয়েছে। মোটকথা সেদিন রবীন্দ্রনাথ

প্রতীচ্যের অদ্ভুত আকর্ষণের থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্য থেকে আত্মশক্তি সঞ্চয় করে আত্মদীপ হয়ে ওঠার যে উপায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, লোকায়ত ঐতিহ্যে নিজস্ব প্রাচীন সম্পদে তাঁর এই পথ সন্ধান প্রচেষ্টার জন্যই রবীন্দ্রনাথ আজকের উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদীর কাছে প্রেরণার উৎসরূপে গৃহীত হতে পারেন।

**তিন.** *ঘরে-বাইরেতে* রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নর-নারীর হৃদয়রহস্যের উন্মোচন উপন্যাসের শিল্পরূপ-বিবেচনায় অনেকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারেন নি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে,

> ‘‘এই উপন্যাসে দেশসাধনার যে তত্ত্ব প্রকটিত হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা;... এই মতকে যদি উপন্যাসের স্বাভাবিক বিকাশের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারতেন, তা হলে তাতে কোথাও অপত্তি থাকত না; কিন্তু ঘরে-বাইরেতে বক্তব্য উপস্থিত করবার ভেতরে একটা অস্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা চোখে পড়ে। যে দোষে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর জীবনের উপন্যাস কঠোরভাবে সমালোচিত - রবীন্দ্রনাথও তা থেকে নিষ্কৃতি পান নি।’’[১০] কিংবা
>
> ‘‘ঘরে বাইরের বিষয়বস্তু বা থীম নির্ণয়ে রবীন্দ্রচেতনা, অন্তর্গত একাগ্রতায়, নির্দ্বন্দ্ব নয়’’[১১]

অপরদিকে অশ্রুকুমার সিকদার *ঘরে-বাইরের* মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য শিল্পকুশলতার সন্ধান পেয়েছেন,

> ‘‘নারীস্বাধীনতা, প্রেমের স্বাধিকারের এই সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে জাতীয় স্বাধীনতার সমস্যাকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন – ঘরের কথা এবং বাইরের কথা। দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা অবিভাজ্য – ... দাম্পত্যসম্পর্কের আলোয় দেশের মুক্তির সমস্যাকে দেখা, রাজনৈতিক আদর্শের আলোয় দাম্পত্যজীবনকে দেখা - এই ব্যাপার সম্ভব হয়েছে শিল্পপ্রতিভার আশ্চর্য নিপুণতায়।’’[১২]

এরই পাশাপাশি প্রমথ চৌধুরী এবং বিশ্বপতি চৌধুরী *ঘরে-বাইরে* কে রূপক উপন্যাস

বলে মনে করেছেন। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত একটি পত্রে (২১ ফাল্গুন, ১৩২২) *ঘরে-বাইরে* সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রমথ চৌধুরী এই গল্পটিকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সে বোধ হয় কতকটা লীলাচ্ছলেই করে থাকবেন। এর মধ্যে কোনো জ্ঞানকৃত রূপকের চেষ্টা নেই, এ কেবলমাত্রই গল্প। মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাইরের এবং একের সঙ্গে অন্যের ঘাতপ্রতিঘাতে যে হাসিকান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এর মধ্যে তারই বর্ণনা আছে।"[১৩] রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকৃত ব্যাখ্যা সমর্থন না করলেও বিশ্বপতি চৌধুরী মনে করেছেন, "কেহ যদি ঘরে-বাইরে শ্রেণীর সৃষ্টিকে রূপক নাট্য শ্রেণীর রচনার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে আমাদের আপত্তি করিবার বিশেষ কারণ থাকে না।"[১৪] শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীও *ঘরে-বাইরে*কে রূপক শ্রেণীর রচনা বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে নিখিলেশ প্রাচীন ভারত, সন্দীপ নব্য ইউরোপ এবং বিমলা ভারতবর্ষ।[১৫] এছাড়াও 'ঘরে-বাইরের নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে সেদিন যে-সমস্ত প্রশ্ন উঠেছিল, সীতাদেবী সম্বন্ধে সন্দীপের হঠোক্তি কারো কারো মনে যে ক্রোধের সৃষ্টি করেছিল - আজকের সাহিত্যপাঠকের কাছে তা হাস্যকর'[১৬] বলে মনে হওয়ায় সেই সমস্ত সমালোচনার উল্লেখ থেকে আমরাও বিরত থাকলাম।

### ৬.১.২. আমাদের পাঠে ঘরে-বাইরে -

*ঘরে-বাইরে* সংক্রান্ত এতসব বিরুদ্ধ মত উপন্যাসটির বহুস্বরিকতারই (Polyphonicity) পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ পাঠকের হস্তক্ষেপের ফলেই কোনো পাঠকৃতি যে অনেকার্থদ্যোতক হয়ে ওঠে তা *ঘরে-বাইরে* প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকৃত মন্তব্যে স্পষ্ট।

> "ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা হচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং লেখকের ভালোমন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই রঙিন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের।"[১৭]

স্বাধীনতার পঁয়ষট্টি বৎসর পর আজও যখন গ্রামে-গাঁথা দেশ ভারতবর্ষের সিংহভাগ গ্রাম

বিজলীবাতি, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সুবিধা থেকে বঞ্চিত; ডাইনী হত্যা, বাল্যবিবাহ, কৃষকের আত্মহত্যা, নিরক্ষরতা, ক্রমবর্ধিত লৈঙ্গিক বৈষম্য প্রভৃতি বিবিধ পাহাড় প্রমাণ সমস্যায় জর্জরিত ভারতবর্ষ পনেরোটি সাধারণ নির্বাচন পাড় করে দেয়, তখন রবীন্দ্রনাথের স্বদেশনীতির পুনর্মূল্যায়ন একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনাপুঞ্জ *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে প্রতিফলিত হওয়ায় এবং এর সাথে ব্যক্তিমুক্তির প্রসঙ্গটি জড়িত হয়ে থাকায় *ঘরে-বাইরে*র রচনাকালীন সময়ের থেকে এক শতকের কালিক দূরত্বে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিশীলিত পাঠকের (Informed reader) কাছে *ঘরে-বাইরে* পুনঃপাঠের দাবি রাখে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন *ঘরে-বাইরে* কেন্দ্রিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করে নিজের অবস্থানটি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন,

> "আমিও দেশকে ভালোবাসি, তা যদি না হত তা হলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না, কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তা হলে মনে এই সান্তস্কা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করি নি। দুঃখ পাই তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমার সকলের চেয়ে বেদনার বিষয় এই যে, যা সত্য মনে করি তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখিকার মতো অনেক সরল, শ্রদ্ধাবান, স্বদেশবৎসল ও সকরুণ হৃদয়ে বেদনা দিয়েছি। সে আমার দুর্ভাগ্য কিন্তু সে আমার অপরাধ নয়।"[১৮]

স্বদেশীর উন্মাদনার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন সমাজে চলতি হাওয়ার পন্থী না হয়ে যা সত্য বলে মনে করেছেন তাকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করার মতো দুঃসাহসিকতায় *ঘরে-বাইরে* দীপ্যমান। তৎকালীন জনরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে জনমনোরঞ্জন নয়, বরং *ঘরে-বাইরে*তে বিকল্প মতাদর্শের প্রস্তাবনা সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ যে করেছেন, তাঁর স্বীকৃতিতে তা স্পষ্ট, "যদি বলা যায় গল্পের খাতিরের চেয়ে দেশের খাতির বড়ো, তবে সে কথা পাঠক সম্বন্ধেও যেমন খাটে লেখক

সম্বন্ধেও তেমনি। তাঁর সাময়িক একদল পাঠক তাঁকে বাহবা দেবে এ কথা লেখকের ভাববার নয়, তিনি ভাববেন তাঁর গল্পটি ঠিকমত হওয়া চাই; তাও যদি তাঁকে ভাবতে দেওয়া না যায় তবে দেশের ভালো হয় এই কথাই যেন তিনি ভাবেন, দেশ তাঁকে ভালো বলে এ কথা নয়।"[১৯] এক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে 'ঘরে-বাইরে'র আলোচনায় অগ্রসর হব তা হল -

**এক.** *ঘরে বাইরেতে* রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনাপুঞ্জের শিল্পিত প্রকাশ ঘটায় তা আজকের দিনেও পুনঃপাঠের দাবি রাখে।

**দুই.** বিমলাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমুক্তি-বিষয়ক যে প্রাগ্রসর চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে তাতে আজকের নারীচেতনাবাদের পূর্বগামী ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

**তিন.** রবীন্দ্রচেতনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা পরস্পর নিঃসম্পর্কিত নয়, দুটি যেন 'গোপন সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্কে' সম্পর্কিত।

- ২ -

**৬.২. ঘরে-বাইরে ঃ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনাপুঞ্জের শিল্পরূপ** -

এই গবেষণাসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে *গোরা* উপন্যাসের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি সময়ের দিকথেকে উপন্যাসটি দ্বিমাত্রিক। *গোরার* ঘটনাকাল উনিশ শতকের আটের দশক, এই সময়কে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেল স্বদেশী উন্মাদনার আবহে। অপরদিকে *ঘরে-বাইরের* ঘটনাকাল স্বদেশী আন্দোলনের উত্তুঙ্গ পর্যায়, রবীন্দ্রনাথ এই সময়কে উপন্যাসে ধরেছেন ১৯১৬ সালে, ১৯১১ র বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হবার পর আন্দোলনের সর্বাত্মক বিনষ্টির পর। ফলতঃ স্বদেশী যুগে আন্দোলনের কুফল ও সীমাবদ্ধতা, যা রবীন্দ্রনাথের অনুমানের স্তরে ছিল, উপন্যাসটির রচনাকালে সেই অনুমান সময়ের দ্বারা পরীক্ষিত সত্য হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তুঙ্গ সময়ে রবীন্দ্রনাথ যদি এ উপন্যাস লিখতেন তবে সন্দীপের মধ্যদিয়ে আন্দোলনের বিপজ্জনক দিকটি এত প্রকটভাবে উঠে আসতে পারত না হয়তো, যা

সম্ভব হয়েছে সেই সময়ের থেকে কালিক দূরত্বের জন্য। আর *ঘরে-বাইরের* পটভূমি গ্রামিণ ভারত হওয়ায় এলিট বিপ্লবীদের গ্রামের মূল স্পন্দনের সাথে বিচ্ছিন্নতার দিকটিও প্রকট হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের প্রথম দিকের আন্দোলনের মধ্যে গণবিচ্ছিন্নতার দিকটি রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। *পল্লীপ্রকৃতিতে* রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> "তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্স নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এ দেশের লোক বলে অনুভব করতেন। ... আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন।"

এছাড়াও গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক প্রয়াসকে তিনি কোন চোখে দেখতেন, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে *চেঁচিয়ে বলা, জিহ্বা আস্স্কালন, টৌন হলের তামাশা, হাতেকলমে* প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক রচনায়। রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট ছিল শৃঙ্খলিত মানবসত্তার মুক্তি ও পূর্ণতম বিকাশ। আত্মশক্তিতে ভাস্বর হলেই লাঞ্ছিত মানুষের সবরকম শোষণমুক্তি সম্ভব। এই আত্মিক স্বাধীনতার মধ্যদিয়েই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। কেননা তাঁর কাছে স্বদেশ সাধনা, দেশসেবা ছিল দেশের মানুষের সর্ববিধ উন্নতি, পল্লীসংস্কার, সমবায় ব্যাঙ্ক, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতীর মধ্যদিয়ে যার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটেছে। এই উন্নত, মুক্ত আত্মশক্তিতে বলীয়ান দেশবাসীই পারে সুস্থ সুন্দর দেশ গঠন করতে। বিপুল সংখ্যক মানুষকে অশিক্ষা-অজ্ঞানতার কালো অন্ধকারে রেখে মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত মানুষের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন যে কখনই ভবিষ্যতের জন্য কাঙ্খিত সুফল ফলাতে পারে না, এর অভ্রান্ততা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসংশয়। রবীন্দ্রনাথ যে সেদিন কতটা সঠিক ছিলেন, তার প্রমাণ আমরা আজ যেন আরও বেশি করে পাচ্ছি। এদেশের বৃহৎ সংখ্যক মানুষের 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা না দিয়ে 'ক্লান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশার আলো না জস্কলিয়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতার পর বৃহৎ গণতন্ত্রের আঙিনায় দীর্ঘ অবহেলা পীড়িত এই বৃহৎ সংখ্যক মানুষগুলি মানুষ হিসেবে নয়, বরং ভোটার হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে, দিন যত এগোচ্ছে এদের ভোটারত্ব যেন তত বেশি প্রকট হয়ে পড়ছে।

১৯০৮ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ নরমপন্থী ও চরমপন্থীর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে চরমপন্থীদের হৃদয়াবেগকে বোঝার চেষ্টা করলেও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সমর্থন করতে পারেন নি। দেশীয় শিল্পের উন্নতি না করে একপেশে ভাবে বিদেশী দ্রব্য বয়কটকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ এই অভিভাষণে সর্ববিধ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন স্বদেশী সমাজ ও পল্লীসমাজ সংগঠনের উপর। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন রায়তদের ওপর। রবীন্দ্রনাথ যুক্তিনিষ্ঠভাবে দেখিয়েছেন দেশের বৃহৎ সংখ্যক অত্যাচারিত ও শোষিত রায়তদের 'মানুষ হইতে না শিখাইয়া' স্বরাজ বা স্বাধীনতা সম্ভব নয়।[২০] উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাংগঠনিক পরিকল্পনার মূল তিন নীতি - Organisation, গণচেতনা ও গণসংযোগ কংগ্রেসের বিবদমান দুই গোষ্ঠীর নেতা ও কর্মীদের কাছে উপস্থাপন করেছেন।

> "প্রথম, বর্তমান কালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি - জোট বাঁধা, ব্যূহ বদ্ধতা, অর্গ্যানিজেশন।... অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে, গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।... দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না।... জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।... তৃতীয়, এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতে পারে না। শিক্ষিত সমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।... সর্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিত সমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনও সম্ভবপর হইবে না।"[২১]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই রাজনৈতিক উত্তেজনাহীন জনসংযোগ ও পল্লী উন্নয়ণের

মধ্যদিয়ে দেশের প্রাণশক্তি জাগানোর পরিকল্পনাটিকে কেউই গুরুত্ব দেয় নি। গণসংযোগ, গণচেতনার প্রতি গুরুত্ব না দিলে তার কুফল কি হবে, যা ছিল সে সময়ের রবীন্দ্রনাথের Hypothesis, ১৯১১ র বঙ্গভঙ্গ রদের পর আন্দোলনের সর্বাত্মক বিনষ্টির মধ্য দিয়ে তা বাস্তব সত্যের মত জ্জ্বল্ক জ্জ্বল্ক করে ওঠে। এই সময় *ঘরে-বাইরে* রচিত। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত তাই বিশেষ অনুধাবনের দাবি রাখে।

*ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে বিধৃত রাজনৈতিক চিন্তা যেহেতু রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড চেতনালোকেরই শিল্পীত প্রকাশ, তাই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের দিকে অবলোচন অবশ্যস্কাবী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, স্বদেশী যুগে তৎকালীন উন্মাদনার প্রতিস্রোতপন্থী রবীন্দ্রনাথ যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, জীবনের প্রান্তবেলা পর্যন্ত তিনি তাঁর সেই অবস্থানে অনড় ছিলেন। নিখিলেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যা প্রকাশিত।

**৬.২.১. রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ঃ পুনঃপাঠের প্রয়োজনীয়তা** -

গোপাল হালদার রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা প্রসঙ্গে লিখেছেন - "যে পরিবার-পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাতে স্বাদেশিকতা ছিল তাঁর আজন্ম সংস্কার। আর, ইতিহাসের যে পর্বে তাঁর জীবন উদ্‌যাপিত তাতে মানুষের ভবিতব্য হয়ে উঠেছিল তাঁর সুগস্কীর ধ্যানের বিষয়।"[২২] রবীন্দ্রনাথ যদিও লিখেছেন 'সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি আলোচনা শুরু করি', তবুও দেখা যায় প্রদীপ জ্জ্বস্কলাবার পূর্বে সলতে পাকানোর প্রস্তুতির মতই 'সাধনা'য় (১৮৯২) তাঁর রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ১২৯১ এর আশ্বিনে 'ভারতী'তে প্রকাশিত *হাতে কলমে* প্রবন্ধে 'স্বদেশের লোক স্বদেশের লোককে সাহায্য করবে, ইহাই স্বদেশ-হিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা' - উপলস্কি যেন 'সাধনা' পর্যায়ের পূর্বপ্রস্তুতি, যার মধ্যে আবার প্রচ্ছন্ন থাকে বিশ বৎসর পরের স্বদেশী সমাজ এর পূর্বাভাষ। যদিও এরও পূর্বপ্রস্তুতি ছিল হিন্দুমেলার মধ্যে, যা মূলত অরাজনৈতিক এবং গঠনমূলক হলেও ভারতের স্বাদেশিকতার

ইতিহাসের আলোচনায় যার উল্লেখ অবশ্যস্কাবী। হিন্দুমেলাকে অবলম্বন করে স্বাদেশিকতার যে আবহ তৈরি হয়েছিল, জন্মসূত্রে রবীন্দ্রনাথ সেই আবহাওয়ায় লালিত, *জীবনস্মৃতি*তে যার স্বীকৃতি সুরক্ষিত,

> ‘‘বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। … আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। … ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলস্কির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। … এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।’’[২৩]

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অবতরণিকায় এ-কথা পুনরুচ্চারিত -

> ‘‘হিন্দুমেলার পরামর্শ আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা ‘জয় ভারতের জয়’, গুণদাদার লেখা ‘লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে’, বড়দাদার ‘মলিনমুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি’। জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি মড়ার হাড়ের খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।’’[২৪]

পরিণত বয়সে পৌঁছে সেদিনের ‘ক্ষ্যাপামির তপ্ত হাওয়ায় উড়ে বেড়ানোর’ দিনগুলির মধ্যে কিছুটা কৌতূকের সুরে ‘ভারত উদ্ধারের দীক্ষা’ পাওয়ার সংবাদ দিলেও জীবনের কোনো অর্জনই যেহেতু তাৎপর্যশূন্য হয় না, শৈশবের হিন্দুমেলা ও গুপ্তসমিতির অভিঘাত রবীন্দ্রনাথের

পরবর্তী স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে পড়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষত হিন্দুমেলার কার্যবিবরণীতে 'প্রত্যেক বৎসর আমাদিগের হিন্দু সমাজের কতদূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের' মতো সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য থাকলেও 'স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করা'র[২৫] মতো গঠনমূলক উদ্দেশ্যও ছিল। যে গঠনমূলক আদর্শ ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার প্রধান ভিত্তি।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই ১৮৯২ - এর শাসন বিষয়ক আইন, তিলকের কারাদণ্ড, শাসকশক্তির দমননীতি, কার্জনী আমলের শিক্ষা সংকোচ, কৃষ্ণ-আফ্রিকায় অত্যাচার ও বুয়র যুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে উদ্ধত মত্ততা প্রকট করে তুলছিল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার গভীর প্রভাব পড়েছিল। দেশের বিরাট কর্মপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ পেল *এবার ফিরাও মোরে* কবিতাটিতে (১৮৯৪) -

"কবি, তবে উঠে এসো - যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।"[২৬]

এই কবিতাটিতে নিজেকে কর্মপ্রবাহে সঁপে দেওয়ার ইচ্ছাই শুধু নয়, বরং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মধারাটিকেও স্পষ্ট করে জানালেন -

"ওই-যে দঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহিচলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার -"

*ঘরে-বাইরে*র পঞ্চু কিংবা নাম-পরিচয়হীন চাষিটি, যে 'তার ছেলেমেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল' এবং একজন স্বদেশী যুবক যার 'সেই শাল-ক'টা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে', কিংবা প্রতিবাদী মিরজান, যার রুজি-রুটির একমাত্র অবলম্বন নৌকোটি দেশসেবকের দল ডুবিয়ে দিয়ে তার প্রতিবাদের দণ্ড দিয়েছে; এরা সকলেই যেন কবিতাদ্ধৃত

'মূক' জনতারই প্রতিনিধিত্ব করেছে। যারা -

"নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশ বলতে ছিল 'শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী' লেখা এই সমস্ত অবহেলিত জনতা, এদের উন্নতি-প্রচেষ্টা ছিল তাঁর কাছে দেশ সেবার নামান্তর। তাঁর সংকল্প এবার ফিরাও মোরে কবিতায় স্পষ্টোচ্চারিত -

"এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ...
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।"

স্বদেশহিতের বাসনায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশী আন্দোলন যেন বিরাট কর্মক্ষেত্রের আহ্বান নিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ নিয়ে সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পূর্ণ উদ্যম সহ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন - "রবীন্দ্রনাথ নিজে মিছিলের সঙ্গে ঘুরলেন পাড়ায়-পাড়ায়, ভদ্র-অভদ্র স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার না করে সকলের হাতেই রাখী বাঁধলেন - পথের পাশে মুসলমান গাড়োয়ানের হাতে রাঙা রাখী পরাতে তারা বিস্মিত হল।"[২৭] স্বদেশী আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল মূলত গঠনমূলক, তিনি চেয়েছিলেন সৃজনমূলক কাজে এই উস্কীপনার সার্থকতা। *অবস্থা ও ব্যবস্থা* প্রবন্ধের মধ্যদিয়ে তিনি জানালেন - "আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের

হাতে লইতেই হইবে। ... চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে।"[২৮] অর্থাৎ দেখাযাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বয়কট আন্দোলনকে শুধুমাত্র ইংরেজের তৈরি বস্ত্র-লবণ বা মনোহারী সামগ্রী বর্জনের মধ্যেই সীমায়িত রাখেন নি, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন সার্বজনীন শিক্ষা, চাষের উন্নতি সহ গ্রামের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। যে গোড়ার কাজটিই দীর্ঘদিন দেশহিতৈষীদের চোখের বাইরে থেকে গেছে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য স্থাপিত হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনের (১৮৬৭) দুই বছর পূর্বে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টিস শঙ্কুনাথ পণ্ডিত লেখেন,

> "বাংলাদেশের জমিদাররা মূলধন নিয়োগ করে তাদের জমিদারীর উন্নতি করেছেন, এরকম বড়-একটা দেখা যায় না। জমিদাররা এ কাজ করবেন, এ কথা আইনে লেখা আছে বটে, কিন্তু জমিদাররা তা কাজে বিশেষ পরিণত করেন নি।"[২৯]

জাস্টিস সিটনকার বলেছেন,

> "কৃষিকাজের উন্নতির জন্য জমিদাররা কোনরকম দায়িত্ব পালন করেন নি। চাষীদের মূলধন বা বীজ দিয়ে সাহায্য করা, সেচের ব্যবস্থা করা, পথঘাটের উন্নতি করা, এসব কর্তব্য তারা পালন করেন নি।"[৩০]

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ জানান, "জমিদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। তারা নিজেদের রাজা-মহারাজাদের মতো মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাঁদের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশি তারা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে, নিজের নানা রকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। তাছাড়া অত্যাচার যে কতরকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।" এবং

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যে বছর জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বছর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে রায়তদের দখলিস্বত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা হলেও জমিদারদের চক্রান্তে তা ফলপ্রসূ হতে পারে নি। ইতিহাসের গবেষণা জানাচ্ছে -

> "জমিদাররা কৃষিকার্যের উন্নতিতে উদ্যোগী হবে ভেবে তাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিল ব্রিটিশ (অবশ্যই এই ভাবনায় ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য জড়িত ছিল)। কিন্তু কৃষির উন্নতি তো হলই না, বরং রায়তদের ওপর জমিদারি শোষণ সরকারের চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। ক্রমবর্ধমান ভূমিকর ছাড়াও নানারকম আইনী-বেআইনী আবওয়াব, সেস, বেগার; কারণে অকারণে জরিমানা, মামলা, মারধোর ইত্যাদি কৃষকের প্রাণ অতিষ্ট করে তুলেছিল। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে জমিদারি শোষণের বাড়াবাড়ির প্রতিবাদে পাবনা ও বাগুড়ায় ব্যাপক বিদ্রোহ হল।... ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে রায়তদের দখলিস্বত্ব দেবার ব্যবস্থা হল।... আইনে অনেক অস্পষ্টতাও ছিল। জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতা আটকানো গেল না।"[৩১]

**৬.২.২. স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নিখিলেশ** -

এই যখন দেশের বাস্তব অবস্থা, তখন রবীন্দ্রনাথ অভ্রান্তভাবে গ্রামের জীবনপ্রবাহের দিকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের অবস্থানটি দৃঢ় করে নিয়েছিলেন। অপরদিকে বয়কটের নেশায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, স্বদেশী সমাজ, স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী অর্থনীতি, পল্লীসংস্কার প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে তৎকালীন নেতৃবর্গের কোনো আন্তরিক ইচ্ছা যেমন ছিল না, তেমনি এগুলির রূপায়ণের জন্য পরিকল্পিত কোনো কর্মসূচিও তাদের দ্বারা গৃহীত হয় নি। এর পাশাপাশি অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং ডন সোসাইটি ও অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির নেতৃবর্গ পরিচালিত চরমপন্থী আন্দোলন শুধুমাত্র শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবসমাজের একাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।

ফলতঃ এই দুই ধারার আন্দোলনই দেশের মূল প্রবাহ, গ্রামাঞ্চলের বিপুল কৃষক শ্রেণীর গণসমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকল। ইতিহাসের গবেষণা জানাচ্ছে,

> "বয়কট আন্দোলন কার্যকরীভাবে বিদেশী পণ্য বিক্রি বন্ধ করতে পারে নি। জাতীয়শিক্ষা আন্দোলন অল্প দিনের মধ্যে স্তিমিত হয়ে আসে। গঠনমূলক কাজ ক্রমশ জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বহু ক্ষেত্রে জামিদারদের সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবকরা সাধারণ মানুষকে উৎপীড়ন করতে ছাড়েনি ... বাঙালি ভদ্রলোকেরা কৃষকদের সংগে যুক্ত হয়ে কোন বৃহত্তর সংগ্রামের অংশীদার হতে পারেন নি।"[৩২]

তৎকালীন বয়কট কর্মসূচী থেকে সাধারণ গ্রামীণ শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা কতটা ব্যাপক ছিল, তা জানা যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে,

> "দেশ মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতেছে। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া বিলাতী বস্ত্র, লবণ, চিনি ও মনোহারী সামগ্রী বর্জন করিবার জন্য সকলকেই উৎসাহিত করা হইতে লাগিল। এই সকল বক্তৃতা সর্বদা ভাবালুতা বর্জিত হইত না এবং বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক যুক্তিধারা আশ্রয়ী হইত না। সস্তায় সুন্দর মসৃণ বিলাতী বস্ত্রের স্থানে মহার্ঘ্য মোটা বোম্বাই কাপড় ক্রয় করিতে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায়ই অনিচ্ছা দেখা যাইত। দেশ কি, ইংরেজ কোথায়, কাহাকে অত্যাচার অপমান করিতেছে ইত্যাদি কথা তাহাদের নিকট অত্যন্ত অস্পষ্ট। বরং তাহারা দেখে, জামিদার মহাজন ও বর্ণহিন্দুর অত্যাচার হইতে তাহাদের রক্ষা করে ইংরেজ শাসক বা তাহারই অধীনস্ত শিক্ষিত কর্মচারীরা। জনতার নিকট ইংরেজ শোষক, ইংরেজ লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি বাক্য সম্পূর্ণ অর্থশূন্য - তাহারা দেখিতেছে তাহাদের শোষণ করিতেছে তাহাদের পাইক পেয়াদা। তাহাদের অস্থিমজ্জা সার করিতেছে গ্রামের সুদখোর হিন্দুমহাজনেরা ও ভ্রাম্যমান মুসলমান কাবুলীরা। ইংরেজ কোথায়?"[৩৩]

ফলে স্বেচ্ছাসেবকগণ বয়কট কর্মসূচি রূপায়ণ করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে জোর-জুলুমের সাহায্য নেয়। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে পঞ্চুর ব্যবসার বিলাতী সামগ্রী পুড়িয়ে দেওয়া, দরিদ্র কৃষকের ছেলেমেয়ের জন্য ক্রয় করা জর্মন শাল পুড়িয়ে দেওয়া, মিরজানের নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া সেই ইতিহাসেরই বিচূর্ণিত অংশ। নিখিলেশের প্রতিবেশি জমিদার হরিশ কুণ্ডু ও সানকিডাঙার চক্রবর্তীদের প্রজাপীড়নের পাশবিক কাহিনী সন্দীপের শিক্ষাগুণে যখন স্বেচ্ছাসেবক যুবকদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠছিল, তখন নিখিলেশের বক্তব্য 'এই-সব-গোমস্তা এই-সব কুণ্ডু এই-সব চক্রবর্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার' তা আসলে রবীন্দ্রনাথেরই সংকল্প।

বলপ্রয়োগ ও অত্যাচারের মাধ্যমে বয়কট আন্দোলন সফল করার স্বেচ্ছাসেবকদের চেষ্টার সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

> "আমরা ধৈর্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া, বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার-সাধনের কাছে আর-কোনো ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না।... এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।"[৩৪]

সন্দীপের বক্তব্যে এর সমর্থন পাওয়া যায়,

> "আমি বললুম, যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বখশিস দেওয়া চলবে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না।" (সন্দীপের আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়)

বিলাতী বর্জনের কর্মসূচী সন্ত্রাসবাদের অন্ধগলির আশ্রয়ে যে সেদিন শেষপর্যন্ত রূপায়িত হতে চলেছিল, তার অভিঘাত রবীন্দ্রনাথ ও নিখিলেশ দুজনের জীবনেই পড়েছিল।

"অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি, সেখানকার কোনো-একটি বড়ো বাজারের লোকে নোটিস পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে ... এইরূপভাবে নোটিস দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ... ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।"[৩৫]

নিখিলেশ জানাচ্ছে,

"এ দিকে আমার নামে লাল কালিতে লেখা একখানা চিঠি এসেছে, তাতে খবর দিয়েছে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেছে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। নাম সই করেছে, 'মায়ের কোলের অধম শরিক, শ্রীঅম্বিকারচরণ গুপ্ত।" (নিখিলেশের আত্মকথা - পঞ্চম পর্যায়)

অথচ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অনুভব করি গ্রামের মধ্যে দেশের প্রাণশক্তি উপলব্ধি করে, তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্ম সেদিন কতটা উপযোগী ছিল। নিখিলেশের মধ্যে যার ছাপ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ জমিদারীকে কোন চোখে দেখতেন, তা বোঝা যায় জমিদারীর ম্যানেজার জানকীনাথ রায়কে লেখা এক পত্রথেকে, "আমি জামিদারীকে কেবল নিজের লাভ লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারি না। অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদের প্রতি নির্ভর করে। ইহাদের প্রতি কর্তব্য পালনের দ্বারা ধর্মরক্ষা করিতে হইবে। এ পর্যন্ত যে সকল কর্মচারী ছিলেন তাঁহারা অনেকে কর্মপটু ছিলেন কিন্তু সকলেই আমাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছেন।"[৩৬] এই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত জমিদার রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। কালীগ্রাম নিজস্ব জামিদারীর অন্তর্ভুক্তির পর প্রতিকূল অবস্থা দেখে প্রজাদের খাজনা পুরোপুরি মকুব করে, প্রজাদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়

খুলে, পুণ্যাহের দিনে (১৮৯০) প্রজাদের সাথে একাসনে বসে, কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘ মামলায় পর্যুদস্ত শিলাইদহের প্রজা দ্বারী বিশ্বাসকে ক্ষমা করে তার সকল সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে।

নিখিলেশের মধ্যেও এ ধরনের প্রজাদরদী জমিদারের চরিত্র দুর্লক্ষ্য থাকে না। বিমলা জানাচ্ছে "আমার স্বামীর দানের লিস্ট ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল কিংবা ধান ভানার যন্ত্র কিংবা ঐরকম একটা-কিছু যে কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত তিনি সাহায্য করেছেন।" (বিমলার আত্মকথা - প্রথম পর্যায়) স্বদেশীর উন্মাদনায় নয়, বরং স্বদেশের উন্নতিকল্পে, স্বদেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বের লক্ষ্যে স্বদেশী উন্মাদনার অনেক পূর্বেই যে নিখিলেশ বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, তার সাক্ষ্য উপন্যাসে স্পষ্ট। "আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন, তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র - কী করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে এক জায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জস্কল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন। শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে পড়তে লাগল যে কারবার টিকল না। চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে-সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য, ... তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। ... একটা ছোটো গোছের ব্যাঙ্ক খুললেন। ... বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরীযাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কোম্পানি উঠন; তার একখানা জাহাজও ভাসেনি, কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেছে।" (বিমলার আত্মকথা - প্রথম পর্যায়) নিখিলেশের এহেন কর্মকাণ্ডের পেছনে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী পাগল' জ্যোতিদাদার স্মৃতি ও তাঁর নিজের সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের অভিজ্ঞতার ছায়া পড়া অস্বাভাবিক নয়। ঔপনিবেশিক শাসকের স্বার্থবুদ্ধিজাত শিল্পনীতি যে এদেশে শিল্পপ্রসারের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল, যে কথার পুনরাবৃত্তি অনেক অর্থনীতির ইতিহাস গ্রন্থে করা হয়েছে, সেদিনের স্বদেশী নেতাদের মধ্যে স্বদেশী শিল্পবিরোধী ব্রিটিশ শিল্পনীতির বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন কর্মসূচীর পরিকল্পনা ছিল না। একারণেই সেদিন তাদের 'বক্তৃতা সর্বদা

ভাবালুতা বর্জিত হইত না এবং বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক যুক্তিধারা আশ্রয়ী হইত না।' অপরদিকে নিখিলেশ পালিটিক্যাল ইকনমি শুধু নিজে পড়ে নি, বিমলাকেও পড়িয়েছে।

দেশের বৃহৎসংখ্যক পল্লীবাসীর প্রতি উদাসীন থেকে শুধুমাত্র মধ্যবিত্তসুলভ মর্যদাবোধের আবেগের বাষ্প ছড়িয়ে বা বলপ্রয়োগ করে স্বদেশী আন্দোলনের তৎকালীন প্রচেষ্টার সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয় - কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনোদিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে খাটো করে না।"[৩৭] নিখিলেশের স্বদেশচিন্তায় এর ছাপ স্পষ্ট। নিখিলেশ - চন্দ্রনাথবাবু ও রবীন্দ্রনাথের অবস্থান এক্ষেত্রে অভিন্ন। স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকেরা নিখিলেশকে তার শুকসায়রের হাট থেকে বিলাতী বস্তু একেবারে উঠিয়ে দিতে বললে চন্দ্রনাথবাবু বলেছেন, "দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই সমস্ত মানুষই তো। তা তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, এরা সইবে কেন ...।" (নিখিলেশের আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়) চন্দ্রনাথবাবুর এই যুক্তি রবীন্দ্রনাথের একাধিক প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে।

**ক.** "বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না। ... 'যাহারা কখনও বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে, তাহারা আজ কাপড়-পরানো বা অন্য যে-কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে ইহা আমরা সহ্য করিব না'- দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে।"[৩৮]

**খ.** "আজ আমাদের ইংরেজি জানা শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে আমরা উভয়ে ভাই - তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না।

যাহাদিগকে আমরা 'চাষা ব্যাটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখ দুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গবর্নমেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয় ... আজ হঠাৎ ভাই সম্পর্কে পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা।"[৩৯]

স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে চন্দ্রনাথবাবু বলেছেন, "তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু-পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, ... কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপর। ওরা প্রতিদিনই মরণ বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টিকে থাকবার জন্যে - ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না - ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও ...।" (নিখিলেশের আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়) জীবনের মহলে বরাবর দুটি শ্রেণীর দুটি ভিন্ন কোঠায় অবস্থান অচল অনড় সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণী সচলতার (Class Mobility) দীর্ঘ স্থিতিশীলতার দিকে ইঙ্গিত করে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সুফলভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বংশানুক্রমে সমাজের উপরতলায় এবং ঔপনিবেশিক ভূমিব্যবস্থার কুফলভোগী কৃষকশ্রেণীর সমাজের নীচের তলায় বংশানুক্রমে অবস্থানের ইতিহাস চন্দ্রনাথবাবুর বক্তব্যে যেন আভাসিত। প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একথাই বলেছেন ভিন্নভাবে "যে মানুষ ত্যাগ করছে তার অনেক কাপড় আছে আর যাকে জোর করে ত্যাগ দুঃখ ভোগ করাচ্ছি কাপড়ের অভাবে সে ঘরের বার হতে পারছে না। এমনতরো জবরদস্তির প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষালন হয় না। বার বার বলেছি আবার বলব, বাহ্য ফলের লোভে আমরা মনকে খোয়াতে পারব না।"[৪০]

গণবিচ্ছিন্ন আন্দোলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে কেবল যে শক্তির অপচয় ছিল, তাই নয়, বরং এর মধ্যে নিখিলেশ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই মনুষ্যত্বের

অবমাননা লক্ষ্য করেছেন। দরিদ্র জনসাধারণের উপর স্বদেশী প্রচারকদের বলপ্রয়োগের সমালোচনা করে নিখিলেশ বলেছে, "মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয়, তা হলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষত্ব থেকে বঞ্চিত করা।" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, তা যেন নিখিলেশের উদ্ধৃত বক্তব্যের পরিপূরক, "বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি, আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়; অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে - অথচ চালানোর সকলের চেয়ে সহজ উপায় জবরদস্তি।"[৪১]

**৬.২.২.১. রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী চিন্তায় শিল্পায়নের গুরুত্ব** -

স্বদেশী আন্দোলনের কর্মপন্থা অনুযায়ী দেশি পণ্যের ব্যবহারের যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হবার পর *ঘরে-বাইরে* রচনাকালীন সময়েও দেশি পণ্য ব্যবহারের মধ্যদিয়ে স্বদেশচর্চা অব্যাহত থেকেছে। পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজ আন্দোলনের সূত্রে দেশি পণ্য ব্যবহারের হিড়িক আরও একবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি পণ্য ব্যবহার বিরোধী ছিলেন না, তিনি শুধু চেয়েছিলেন ম্যানচেষ্টার বর্জনের আগে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে বিদেশী পণ্যের সাথে পাল্লা দেবার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে। যে উন্নতি আসতে পারে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের ব্যবহারের ফলে দেশি শিল্পের আধুনিকীকরণের মধ্যদিয়ে। *শেষকথা* গল্পের (১৩৪৬) নবীনমাধব যথার্থই উপলব্ধি করেছিল, দেশীয় শিল্পের উন্নতি করতে গেলে প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার চর্চা। "আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ... কিন্তু বিদেশে কিছুদিন থাকতেই একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম - আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম, সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়েনি ব্রিটিশ রাজরক্তে। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে

ঝাঁপ দিয়ে পড়ছিলুম, তখন বুঝতে পারি নি সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জস্কলানো হচ্ছে না, জস্কলাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল। ... তখন ঠিক করলুম ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে। ... এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা। ... অধীর হয়ে ফল নেই, গোড়া থেকেই কাজ শুরু করতে হবে - পথ দীর্ঘ সাধনা কঠিন। ... এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে, কুড়ুল নিয়ে, হাতুড়ি নিয়ে, দেশের গুপ্তধনের তল্লাশে - এই কাজটিকে কবির গদ্‌গদ্ কণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পূজা বলে চিনতেই পারবে না।"[৪২] নবীনমাধব দেশের উন্নতি ও সেবার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে প্রয়োজনীয়তা উপলস্কি করেছিল, *ল্যাবরেটরি* (১৩৪৭) গল্পের নন্দকিশোর ও সোহিনীও বিজ্ঞানের প্রসার ও চর্চার মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি সস্কাবনা দেখেছিল (স্মরণীয় সোহিনীকে ল্যাবরেটরি প্রসঙ্গে নন্দকিশোর বলেছে, 'ঐখানে রেখে গেলেম আমার সদগতি আর অসদগতি আমার দেশের'।) *রবিবার* (১৩৪৬) গল্পেও 'বিভা প্ল্যান করেছে মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দামী গয়না বেচে যা পাবে সেই টাকা অমরকে উপলক্ষ করে দেবে আপন স্বদেশকে।' অমর হল বিজ্ঞানের গবেষক-অধ্যাপক।

অথচ এই গল্পগুলি রচিত হবার বহুপূর্বে 'যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের পাল্লা' দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলস্কি করে রবীন্দ্রনাথ নিজ পুত্র ও জামাতাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন আধুনিক যন্ত্রবিদ্যা শিখে এসে ভারতে তা প্রয়োগ করার উস্কেশ্যে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, "রবীন্দ্রনাথ এঁদের পাঠালেন কৃষি-কাজ শেখবার জন্য। ভারতের গোড়া-ঘেঁষা সমস্যা - পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে, পর্যাপ্ত খাদ্য পেলেই মানুষের উদবৃত্ত শক্তি বাড়বে এবং তারই উপর নির্ভর করে জাতির সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি। সেই সমস্যা-সমাধানের জন্য রথীন্দ্রনাথ (১৭) ও সন্তোষচন্দ্রকে (১৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠালেন কৃষি ও গোপালন বিদ্যা শিক্ষার জন্য; কিছুকাল পরে কনিষ্ট জামাতাকেও পাঠান এই একই উস্কেশ্যে।"[৪৩]

এবার দেখাযাক *ঘরে-বাইরের* রচনাকালীন সময়ে স্বদেশী পণ্য কতটা উন্নত ছিল।

**ক.** সুকুমার রায় সে যুগের দেশি পণ্য ব্যবহারের উন্মাদনাকে উপজীব্য করে কিছুটা কৌতূকের সুরে গান বেঁধেছিলেন,

"আমরা দিশী পাগলার দল
দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল
দেখতে খারাপ টিকবে কম দামটা একটু বেশি
যা হোক না তাতে দেশেরই মঙ্গল,
আমরা দিশী পাগলার দল।"[৪৪]

**খ.** লীলা মজুমদার জানিয়েছেন, "মেজদাদা সুবিনয় ছিল দিশী জিনিস খুঁজে বের করার পাণ্ডা, কোথা থেকে সব খেরোর মতো মোটা খড়খড়ে কাপড়, ত্যাড়া বাঁকা পেয়ালা পিরিচ এনে দিত। পেয়ালাগুলোতে আবার চা ঢালার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিতে হত, নয়তো শোঁ শোঁ করে অর্ধেক চা-ই পেয়ালাতে শুষে নিত। ... ততদিনে আমরা অনেক বিদেশি জিনিস বর্জন করেছি। তবে সব আর হয়ে উঠল না। বই কলম ওষুধপত্র এসব কিনতেই হত। ভয়েল ছেড়ে খস্করের জামা পড়তাম ... ঢাকেশ্বরী কিংবা বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মোটা মোটা কাপড় পড়তাম। ... কয়েক ধোপ পড়লেই কাপড়গুলোর পাড় থেকে ছোপ ছোপ রঙ উঠে যেত।"[৪৫]

অর্থাৎ নিত্যব্যবহার্য দেশি পণ্যের প্রধান তিনটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল -

**এক.** দেখতে খারাপ,

**দুই.** টেকসই নয়, এবং

**তিন.** মূল্য বেশি।

অথচ দেশের বেশিরভাগ মানুষ যখন অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল, তখন তাদের জোর করেই হোক বা স্বদেশীর আফিম খাইয়েই হোক এ-ধরনের পণ্য কিনতে বাধ্য করানোর প্রক্রিয়াকে রাজনীতির দস্যুবৃত্তি (স্মরণীয় চতুরঙ্গ উপন্যাসে দামিনী প্রসঙ্গে 'ভক্তির দস্যুবৃত্তি' শব্দবন্ধের ব্যবহার) ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়। বিলাতি বস্ত্রের বিকল্প রূপে দেশি বস্ত্র যে যথেষ্ট নয়, তা

সন্দীপ জানত, 'সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েছে, এখন বিলিতি শাল-র‍্যাপার-মেরিনো রাখব কি তাড়াব?' (সন্দীপের আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়) সন্দীপের মনে এই প্রশ্ন জাগলেও স্বদেশীর উন্মাদনা সেদিন বজায় রাখতে হয়েছিল। তাই বিস্মিত হতে হয় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির গভীরতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা লক্ষ্য করে, নিজের অবস্থানজনিত যে দৃঢ়তা নিখিলেশের মধ্যেও বিদ্যমান। যখন স্বদেশী শিল্প ও জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির চেষ্টা না করে অনুপযুক্ত স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার এবং স্বদেশপ্রীতি সমার্থক হয়ে উঠেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন স্বদেশী শিল্পের আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং শত নিন্দা-অপবাদ-বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত নিজ অবস্থানে অনড় থেকেছেন। 'যন্ত্রের সাথে যন্ত্রের পাল্লা' দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পরবর্তী কালে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আহ্বান এসেছে। ... মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই। ... এ যুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তা হলেই জিতব, তা হলেই বাঁচব।"[৪৬] কিন্তু নিজস্ব শিল্পের আধুনিকীকরণের কোনো চেষ্টা না করে বিনা প্রশ্নে নির্বিচারে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে' নেওয়ার ফলে প্রকৃতপক্ষে লাভবান হল বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল মালিকরা। অর্থনীতির গবেষণা জানাচ্ছে- "বিদেশীবর্জন আন্দোলনের আসল লাভটা দুর্বলতর তাঁতীদের হাত থেকে কারখানা মালিকেরা কেড়ে নিল। ... বোম্বাই আমেদাবাদের কারখানাগুলি স্বদেশিয়ানার জোয়ারে অনেক বেশি এগিয়ে গেল।"[৪৭]

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন সুরুল সমিতি ইনস্‌টিটিউট অফ রুরাল কমিশন। যেখানে উন্নতমানের বীজ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাট-জোয়ারের চাষ শুরু হয়। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জমিতে আধুনিক প্রণালীতে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়। '১৯২৩সালে স্থাপিত হয় শ্রীনিকেতন ডিসপেনসারি (যা ম্যালেরিয়া উচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করে) এ-সময়েই সুরুল ফার্মে স্থাপিত হয় শ্রীনিকেতন ল্যাবরেটরি। ... আলোচনা ও গবেষণা, ল্যাবরেটরিতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার

মধ্য দিয়ে শ্রীনিকেতনে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। সম্প্রসারণ-সেবার (এক্স্টেনশন সার্ভিস) সঙ্গে যুক্ত হল ব্রতীবালক সংগঠন।তাদের লক্ষ্য গ্রামের সেবা ও জনস্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক প্রচার। ১৯২২ সালেই প্রথম ব্রতীবালক দল অদূরবর্তী মহিদাপুর গ্রামে গ্রামসেবার কাজ শুরু করে। তিরিশের দশকে উনিশটি গ্রামে এই ব্রতীবালক সংগঠন ছড়িয়ে পড়ে।'[৪৮] রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনভাবেই সেদিন পল্লীপুনর্গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কেননা আমাদের দেশ প্রধানত কৃষিপ্রধান, ১৯১১র জনগণনা অনুযায়ী ৯০.৬ শতাংশ মানুষ ছিল পল্লীবাসী।[৪৯] ১৯৪০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বিমানবিহারী মজুমদার লেখেন,

> "ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে এখনও তিন ভাগের দুই ভাগ লোক চাষবাস করিয়া জীবন ধারণ করে। শতকরা আরও বিশ-পঁচিশ জন লোক কৃষিকর্মের আনুষঙ্গিক কাজ -যেমন গরুর গাড়ি চালান, ফসল ও তরকারি বিক্রয় প্রভৃতি করিয়া অন্নসংস্থান করে। দেশের বেশীর ভাগ লোকই যখন চাষবাসের সঙ্গে জড়িত, তখন কৃষকদের মঙ্গল ও অমঙ্গলের উপরেই দেশের কল্যাণ নির্ভর করে। কৃষকদের অবস্থা ভালো হইলে কলকারখানায় তৈয়ারী জিনিসের চাহিদা বাড়ে। ডাক্তার চিকিৎসার জন্য রুগী পায়, উকিল মক্কেল পায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র বাড়ে। কৃষিপ্রধান দেশে আয়ের উৎসই যখন কৃষি, তখন কৃষকের অবস্থার উন্নতি না হইলে কাহারও মঙ্গল নাই।"[৫০]

কৃষি ও কৃষকের উন্নতির ওপরেই যে দেশের উন্নতি নির্ভরশীল তা রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই উপলব্ধি করে হাতে-কলমে পল্লীপুনর্গঠন কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। নিখিলেশের উপলব্ধি এক্ষেত্রে তাৎপর্যবহ, "আজ যারা আমার নীচে রয়েছে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারি নে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।" (নিখিলেশের আত্মকথা - তৃতীয় পর্যায়)

অথচ সেদিন স্বদেশীর উন্মাদনায় পল্লীউন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি স্বদেশী নেতৃবর্গের নজরের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। অমূল্যর মতো তরুণদের বয়কটের অন্ধ মত্ততায় গা ভাসিয়ে দেওয়াকে রবীন্দ্রনাথ তাই সমর্থন করতে পারেন নি। কারণ অমূল্যর মতো তরুণেরা দেশ গঠনের জন্য যে কতটা মূল্যবান, রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর পল্লীপুনর্গঠন কর্মে, ব্রতীবালক সংগঠন তৈরির ক্ষেত্রে। অমূল্যদের মধ্যেই সম্ভাবনা ছিল একজন নন্দকিশোর (ল্যাবরেটরি), একজন নবীনমাধব (শেষ কথা) কিংবা একজন অমর (রবিবার) হওয়ার। যে সম্ভাবনার অপমৃত্যু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন 'তেজস্বী নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী' ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের স্বদেশীর উন্মাদনায় যোগদানের মধ্যে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গঠনমূলক কাজে যাঁকে 'প্রধান সহযোগী' রূপে পেয়েছিলেন, সেই ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পরিণাম সম্পর্কে *চার অধ্যায়* উপন্যাসের আভাস নামক অংশে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন

> "সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজস্কলা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল। এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলন প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।
>
> ...সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোর তেতালার ঘরে একলা বসে ছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। ...বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' ... স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।"[৫১]

অমূল্যর মধ্যদিয়ে প্রকৃত দেশসেবকের একটা আভাস পাওয়া যায়। বিমলার হাত থেকে দেশের কাজে টাকা নেওয়ার গ্লানি তাকে একারণেই দগ্ধ করেছে, "দেশের জন্য মরতে ভয় করি নে, মারতে দয়া করি নে এই শক্তি পেয়েছি; কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছি না।" কিন্তু এই নির্মল মনই সেদিন সন্দীপদের মতো দেশনেতাদের তত্ত্বাবধানে ধ্বংসের পথ ধরেছিল, যার পরিণাম ছিল আত্মধ্বংসী। একারণেই বিমলার মনে হয়েছে 'সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে।' (বিমলার আত্মকথা - পঞ্চম পর্যায়) সেদিনের অমূল্যদের নিজস্ব বিবেক বিবেচনা মুছে দিয়ে প্রচলিত স্বদেশীর সুরে বেঁধে দেওয়ার ঐতিহাসিক সত্যটি সন্দীপের কথায় ব্যক্ত হয়েছে, "ঐ বালক আমার ছায়ার ছায়া, আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি আমার পাশ থেকে সরে গেলে ও কিছুই নয়।" অপরদিকে নিখিলেশের স্বদেশীর উন্মাদনার প্রতি কোনোরকম সমর্থন না জানানোর পেছনে এটাও একটা কারণ ছিল, "যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগতে চাচ্ছে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কোনো হাত না থাকে।" (নিখিলেশের আত্মকথা - ষষ্ঠ পর্যায়) ১৯১১-য় আন্দোলন অবসানের পর একশ্রেণীর স্বদেশী যুবকের যে অনিকেত অবস্থানের উল্লেখ *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে করা হয়েছে, বেঁচে থাকলে অমূল্য হয়তো এদেরই একজন হত। অমূল্যর মতো তরুণদের বয়কট বা সন্ত্রাসবাদের অন্ধগলিতে অপচয় নিখিলেশকে যতটা না বিদ্ধ করেছে, তার চেয়ে বেশি বিদ্ধ করেছে তার স্রষ্টাকে। আর যারা অমূল্যদের করুণ পরিণতির জন্য দায়ি, তাদের প্রতি বরূপতাই কি সন্দীপের থেকে তার স্রষ্টার সহানুভূতি কেড়ে নিয়েছে।

সমকালীন রাজনৈতিক উন্মাদনায় গা না ভাসিয়ে দেশের মানুষের উন্নতির মধ্যদিয়ে বিকল্প পদ্ধতিতে স্বদেশ সেবার ব্রতে অবিচল রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি, যা *ঘরে-বাইরে* প্রকাশকালে জনৈকা পত্রলেখিকার অভিযোগের উত্তরে প্রকাশিত, তা ঘরে ও বাইরে স্বদেশী প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথকে করে তুলেছিল একাকী। নিখিলেশও স্বদেশীর প্রশ্নে ঘরে ও বাইরে একাকী হয়ে পড়েছিল, কেননা, তার স্রষ্টার মতো 'বন্দেমাতরম মন্ত্রটিকে তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি'। নিখিলেশ মনে

করেছে, "দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।" কিংবা "দেশকে সাদাভাবে সত্য বলে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার করে মা ব'লে দেবী ব'লে মন্ত্র প'ড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো-একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ।" (নিখিলেশের আত্মকথা - প্রথম পর্যায়) - এ যেন নিখিলেশের জবানিতে রবীন্দ্রনাথেরই যুক্তি।

**৬.২.২.২. যেদিন বিষ মিশেছিল ঃ সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নিখিলেশ** -

স্বদেশী আন্দোলনে বয়কট কর্মসূচী সফল করতে গিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দেয়, এই সমস্যাটিকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যথার্থ সমাজতাত্ত্বিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে। শতাধিক বৎসরের ব্যবধানে আজকের দিনে স্বদেশী আন্দোলনের যে কয়টি মৌল ভ্রান্তি সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাসের গবেষণায় উঠে আসে, বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ ঘটনাকালীন সময়েই সেই ভ্রান্তিগুলোকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। ইংরেজকৃত যে বিভেদের বিরুদ্ধে সেদিন আন্দোলন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত লক্ষ্য থেকে সেদিন উপলক্ষ বড় হয়ে যাওয়ায় এবং বয়কট আন্দোলনকে সার্থক করতে গিয়ে আমাদের সমস্ত উদ্যম নিয়োজিত হওয়ায় আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিভেদের পথ যতখানি মসৃণ করেছি, ব্রিটিশ সরকারও ততখানি করতে পারে নি। এ বিভেদের মূলে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার ভ্রান্তি থেকে ইতিহাস তার পূর্ণ মূল্য আদায় করে নিতে ছাড়েনি। বহু প্রবন্ধে বহুবার বহুভাবে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের এই সমস্যা নিয়ে যে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন, *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে তা শিল্পরূপ পেয়েছে।

যে দারিদ্র্য অশিক্ষা অজ্ঞানতা কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তার মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের বীজ ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না - ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি- স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না।"[৫২] বিশ শতকের প্রথম দশকে শাস্ত্রের এহেন আধিপত্য উনিশ শতকের নবজাগরণের সীমাবদ্ধতাকেই চিনিয়ে দেয়, যে সীমাবদ্ধতা আজও বহমান থেকে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' সম্প্রদায়িক দাঙ্গার আতঙ্ক জিইয়ে রেখেছে।

এই জরুরি প্রাথমিক কাজটি না করে তৎকালীন নেতৃবর্গ জবরদস্তির মাধ্যমে দরিদ্র মুসলমান শ্রেণীকে বয়কট আন্দোলনে সামিল করতে গিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের ক্ষেত্রটিকেই প্রসারিত করে দেন ইতিহাসের গর্ভে। এমতাবস্থায় বয়কট আন্দোলনের থেকেও সামাজিক ঐক্যসাধন প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়।

> "এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজ-রাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন, এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক না, তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল। না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।... সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে কোনো প্রকারেই হোক, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া

জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।... ক্রমশ লোকের সম্মতি জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না।... এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম ... তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতার দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি।"[৫৩]

দরিদ্র মুসলমান শ্রেণীর প্রতি জবরদস্তির সেদিনের ঐতিহাসিক ভুল *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে ঘাটনিক বাস্তবতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

"এদিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই, জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুক-নাচ নাচাব।

নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে। আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোনখানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে, নইলে ওরা বিরোধ করবেই।"

(সন্দীপের আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়)

কিন্তু সাময়িক লাভের আশায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আমরা-ওরার বিভাজন ঘটিয়ে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে চাইলেই যে দাবিয়ে রাখা যায় না, বরং তার ফলে ভবিষ্যৎ বিষবৃক্ষের বীজ প্রোথিত হয়ে যায়, সেদিনের উচ্ছস্বসে সন্দীপেরা তা বুঝতে পারে নি। ফলত যা অবশ্যস্কাবী তাই হয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মগত যে পার্থক্য ছিলই, তা বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে। নিখিলেশের জমিদারীতে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা দুটি সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে বিবদমান

হয়ে উঠেছে। নিখিলেশের ষষ্ঠ পর্যায়ের আত্মকথায় জানা যায়, "ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই এক জায়গায় গোরু-জবাই দেখা দিল।" এর মূলে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের 'একটা কৃত্রিম জেদ আছে' তা নিখিলেশ যথার্থই উপলব্ধি করেছে। পরবর্তীকালে *হিন্দু মুসলমান* (শ্রাবণ, ১৩৩৮) প্রবন্ধে এহেন ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, "যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গাম বাধে নি। কিন্তু, এক সময়ে যে কারণেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপর পক্ষে কোরবানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবি মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে।"[৫৪] রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিজ্ঞতা, যা তাঁর বহু প্রবন্ধে ব্যক্ত, তা *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ঘনীভূত হওয়ার ঘটনায় শিল্পরূপ পেয়েছে।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মঞ্চগুলি কিভাবে হিন্দুত্ববাদের ছায়ায় গড়ে উঠেছে তা এই গবেষণাপত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে *গোরা* উপন্যাসের আলোচনাসূত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেও এই হিন্দুত্ববোধ যে সমীকৃত হয়েছিল, *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে তার সাক্ষ্য দুর্লভ নয়। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক তিক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ কতটা অভ্রান্ত ছিল, তা বুঝতে পারি ১৯১০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *কৃষক-বন্ধু* নামক পুস্তিকা থেকে। যেখানে কৃষকের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে অত্যাচারিত কৃষকশ্রেণীর সাথে মুসলমানদের এবং অত্যাচারী শ্রেণীর সঙ্গে কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের অনায়াস সমীকরণ করে মুসলমানদের বাঁচার পথ হিসেবে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মুসলিম লিগের রাজনীতি চিহ্নিত হয়েছে-

"তোমার অর্থেতে বাবুগিরি বাবুদের
তুমি না জন্মালে শস্য মরণ তাদের
'কঙ্গরস' 'রঙ্গ-রস' করি বাবুদল
কতদিন করিল ভারত টলমল
বঙ্গের কৃষক প্রায় সব মুসলমান
হিন্দু হবে দুই তিন আনা পরিমাণ
মুসলমান মাত্রেই যে পরস্পর ভাই
এ কথা ভুলো না কেহ, ভুলা নাহি চাই
আপনাকে হীনজাতি কভু না ভাবিবে
মোসলেম সর্বোচ্চ জাতি মনেতে রাখিবে।"[৫৫]

- এ যেন ১৯২৯ এর কাউন্সিল নির্বাচনের পর ১৮ জন মুসলমান সদস্যের সমর্থনে ফজলুল হক যে প্রজা পার্টি তৈরি করবেন, তারই পূর্বাভাস, যার চরম পরিণতি চল্লিশের দশকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশভাগ। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে সন্দীপদের তৎকালীন ভ্রান্ত নীতি, দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতৃত্বকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হয়।

*ছোটো ও বড়ো* (অগ্রহায়ণ, ১৩২৪) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "শির লে আও বলিতে পারিলে রাজকার্য উদ্ধার হইতে পারে, যে রাজকার্য উপস্থিতের কিন্তু রাজনীতির অধঃপতন ঘটে, যে রাজনীতি চিরদিনের।"[৫৬] বয়কট আন্দোলনকে সফল করতে সন্দীপও বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বন করেছে যা ঐতিহাসিক সত্য। এর সাথে মিশেছে আন্দোলনকে হিন্দু ঐতিহ্যের সাথে সমীকৃত করে দেশমাতৃকার পূজা। কিংবা এক হাতে গীতা ও অপর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টা। সন্দীপ স্বীকার করেছে "অনেকদিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তা হলে দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখতে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগবে না। দেশের একটা দেবীপ্রতিমা চাই। ... যে

প্রতিমা চলে আসছে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা করে তুলতে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর করে কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে।" (সন্দীপের আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়) এবং অচিরেই সে অত্যাচারী জামিদার হরিশ কুণ্ডুর সাথে মিলিত হয়ে মহিষমর্দিনী পূজার আয়োজন করেছে। সন্দীপ হয়ে উঠেছে দেবতার স্রষ্টা, 'দেবতার উদ্ধারকর্তা'। এভাবেই সেদিন সন্দীপেরা ধর্মের ধুয়া ও দেশের ধুয়া দুটোকেই সমান তালে চালিয়েছিল। পল্লীগ্রামে দারিদ্র্য-অশিক্ষা-অজ্ঞানতা-শোষণ-বঞ্চনার মধ্যে যে দেশ, সেই জীবন্ত দেশ সেদিনের দেশহিতৈষীদের নজরের বাইরে থেকে গিয়েছিল বলে তাদের কাছে অবলম্বন রূপে দেশমাতৃকার মূর্তিপূজার প্রয়োজন হয়েছিল। - এই মর্মান্তিক সত্যটিও ইতিহাস সমর্থিত। হিন্দুত্ববাদের মোড়কে ঠাসা এধরনের দেশমাতৃকার বন্দনাও মুসলমান সমাজকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার অন্যতম বড় কারণ।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সমর্থন সেদিন অর্জিত হয়েছিল গীতা থেকে। বিমলা জানাচ্ছে

> "অমূল্য কোর্তার পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখলে, তারে পরে একটি ছোটো পিস্তল বের করে আমাকে দেখালে।" (বিমলার আত্মকথা - পঞ্চম পর্যায়)

গীতার আদর্শে অমূল্য বৃদ্ধ খাজাঞ্চিকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত নয়। তার নিজের কথায়

> "গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মাকে তো কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা, ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেইরকম একটা কথা। টাকা কার? ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কারও আত্মার অঙ্গ নয়। ও আজ আমার, কাল আমার ছেলের, আর একদিন আমার মহাজনের। সেই চঞ্চল টাকা যখন তত্ত্বত কারওই নয় তখন তোমার অকর্মণ্য ছেলের হাতে না পড়ে দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তা হলে তাকে নিন্দা করলেই সে কি নিন্দিত হবে?"

সেদিনের চরমপন্থীরা নিজেদের মতো করে গীতার যে ব্যাখ্যা (Interpretation) তৈরি করে নিয়েছিল, অমূল্যের কথায় যা ব্যক্ত, তা ইতিহাস সমর্থিত,

> "গীতার মন্ত্র বিপ্লবীদের নিষ্কাম কর্মে অনুপ্রাণিত করেছে, রাজনৈতিক হত্যাকে সাধারণ খুনের থেকে ভিন্ন বস্তু, আদর্শকৃত্য বলে ভাববার মানসিকতা দিয়েছে। সে যুগে গীতা পাঠ ছিল বিপ্লবীদের পক্ষে আবশ্যিক।"[৫৭]

ভারতে জাতীয় আন্দোলন গ্রন্থ থেকে জানা যায়,

> "...বারীন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীরা বাংলাদেশের সমিতিগুলির মাধ্যমে বালক ও যুবকদের সহিত ভাবচর্চা, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতেন। তাহাদের গীতা পড়াইয়া বুঝাইতেন আত্মা অমর, হত্যা পাপ নহে ইত্যাদি। এইভাবে বিপ্লববাদের বীজবপন হইল ১৯০২ সালে অরবিন্দ যখন বাংলাদেশে আসেন, তখন তিনি মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগোকে এক হাতে গীতা ও আর এক হাতে তরবারি দিয়া গুপ্ত সমিতির কার্যে দীক্ষা দেন।"[৫৮]

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে গীতার এহেন প্রভাব একদিকে যেমন রাজনীতিতে হিন্দুত্বের গোপন পদসঞ্চারের ইঙ্গিত দেয়, যা রাজনীতির হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণের অন্যতম কারণ, তেমনি রাজনৈতিক হত্যাকে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে দেখার বিপজ্জনক প্রবণতারও পরিচয় দেয়। গঠনবাদী রবীন্দ্রনাথ ও নিখিলেশের কাছে দেশের মূল সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকা এহেন বিপ্লবী কর্মপন্থা তাই সমালোচিত হয়েছে, নিখিলেশের তাই মনে হয়েছে এরা 'স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।'

সন্দীপের রাজনৈতিক মতাদর্শের পেছনে অনেক সমালোচক ইয়োরোপের উগ্র রাষ্ট্রনীতির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। যে রাষ্ট্রনীতি মতে ফল লাভটাই আসল, উপায়টা মিথ্যার জমিতে চাষ হলেও তা গ্রহণযোগ্য। সত্যধর্মকে বিকিয়ে দেশকে বড় করে তোলার এই শিক্ষা সন্দীপের মধ্যে ক্রিয়াত্মক রূপ ধরেছে। চন্দ্রনাথবাবুর কথায় সন্দীপের মধ্যে ইয়োরোপের এই উগ্র রাষ্ট্রনীতির

প্রভাবের দিকটি স্পষ্ট হয়েছে, "বিদেশ থেকে এ কী পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ করলে।" নেপাল মজুমদার লিখেছেন, "সন্দীপ এই জীবন-দর্শনের পাঠ লইয়াছে পাশ্চাত্যের নিট্‌শে প্রমুখ দার্শনিকের নিকট হ'তে।"[৫৯] ইয়োরোপের এই ন্যাশনালিজমকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সমর্থন করেন নি। প্রাচ্য জগতে বিভিন্ন সময়ে এই ন্যাশনালিজমের যে ভয়ঙ্কর রূপটি আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাতে শঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন... "This nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age, and eating into its moral validity".[৬০] নৈতিক শক্তি ধ্বংসকারী এই জাতীয়তাবাদের প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে *নৈবেদ্যর* কবিতাতেও -

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম - প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।"[৬১]

আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেও পাশ্চাত্যের উগ্র জাতীয়তাবোধের কালো ছায়া লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে - কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল, সমস্ত নিচে তলাইয়া যায়।"[৬২]

রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল এর বিপরীত মেরুতে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোনো কর্মের উপায় বা পদ্ধতি যদি ন্যায় ও সত্যভিত্তিক না হয়, তবে তার পরিণাম কখনোই শুভ হতে পারে না। রাজনৈতিক হত্যাকে আধ্যাত্মিকতার রঙে মহিমান্বিত করা এবং গীতার মধ্যথেকে তার সমর্থন

খুঁজে পাওয়ার তৎকালীন বিপ্লবীদের প্রচেষ্টাও এ-কারণেই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। যে কোনো মহৎ কর্মে অন্যায়, অসত্য, সংক্ষিপ্তি বা আত্মপ্রতারণার কোনো স্থান রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন,

> "একটি কথা আমরা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই, অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে তাহাকে কোনখানে ঠেকাইব।"[৬৩]

অথচ সেদিন স্বদেশীর নামে এই অসত্যেরই চাষ চলছিল। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে নিখিলেশ সন্দীপ ও চন্দ্রনাথবাবু-র কথোপকথনে সন্দীপের এই বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে -

> "এই লোকটার কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সামনে পুড়িয়েছে, তুমি সাক্ষী দেবে না?
>
> সন্দীপ হেসে বললে, দেব বৈকি। কিন্তু, আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী।
>
> আমি বললুম, সাক্ষী আবার জমিদারের পক্ষে কী? সাক্ষী তো সত্যের পক্ষে।
>
> সন্দীপ বললে, যেটা ঘটেছে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?
>
> আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অন্য সত্যটা কী?
>
> সন্দীপ বললে, যেটা ঘটা দরকার। যে সত্যকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সেই সত্যের জন্য অনেক মিথ্যে চাই, যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হচ্ছে। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি করতে এসেছে তারা সত্যকে মানে না, তারা সত্যকে বানায়।... সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।
>
> মাষ্টারমশাই বললেন, সত্যফল-লাভ।
>
> সন্দীপ বললে, হাঁ, সেই ফসল মিথ্যের আবাদে তবে ফলে।"

আজীবন সত্যকেই 'জীবনের ধ্রুবতারা' বলে গ্রহণ করে চলা রবীন্দ্রনাথ ধর্মবর্জিত সন্দীপের স্বাদেশিকতাকে স্বভাবতই স্বীকার করতে পারেন নি। "যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা। কারণ, রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মনীতির স্থান আছে এ কথা যে ব্যক্তি সম্পূর্ণবিশ্বাসে প্রকাশ করে, লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন, নয় নীতিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্মকে মান্য করা কার্যহন্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে।"[৬৪] - এই যখন বাস্তব বাতাবরণ, তখন স্বাভাবিক ভাবেই নিখিলেশ এই স্বাদেশিকতাকে সমর্থন করতে পারে নি। সত্যের পূজারী নিখিলেশ তার অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছে, "দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, ... তারা দেশকেও মানছে না।"

সকল উন্নত চিন্তাই হিন্দু ধর্মে ও হিন্দু শাস্ত্রে আছে উনিশ শতকের শেষের দিকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের এমন উদ্ভট তত্ত্ব প্রচার করে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে মীরডাল তাঁর Asian Drama গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, 'This may be good tacties, but it is bad sociology,'[৬৫] তা স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মধারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দেশের মূল সমস্যার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বল প্রয়োগ, দেশমাতৃকার পূজা, গীতার নতুন ব্যাখ্যার সাহায্যে রাজনৈতিক হত্যাকে আধ্যাত্মিকতার মহিমায় উজ্জ্বল করা, মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করা প্রভৃতি স্বদেশী আন্দোলনে গৃহীত যে সমস্ত পথগুলি আমরা উল্লেখ করলাম, সেগুলি আশু ফললাভের জন্য 'Good tacties' হতে পারে, কিন্তু বিগত ইতিহাস এবং তা থেকে অনুসৃত বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের শেখায় তা কতটা 'bad sociology' ছিল। আশু ফল-লাভের জন্য চালিত স্বদেশী আন্দোলন ভবিষ্যতের জন্য কি রেখে যাচ্ছে, সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কতটা সচেতন ছিলেন, তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে -

"নিখিল বললে, আমার আয়ু কতদিনই বা? তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে, সেটা হয়তো এখন দেখা যাবে না।

আমি বললুম, আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিল বললে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।" (সন্দীপের আত্মকথা -চতুর্থ পর্যায়)

এই ভবিষ্যৎ ফললাভের জন্যই রবীন্দ্রনাথ সেদিন চলতি হাওয়ার পন্থী হতে পারেন নি। 'শত-শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী' লেখা 'মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে' ভাষা, তাদের বুকে আশার আলো জস্কলানোর চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি যথার্থই উপলস্কি করেছিলেন,

(মার্চ, ১৯৩১) "... আমাদের দেশে আমরা পরাধীন - অর্থাৎ, আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?[৬৬]

রবীন্দ্রনাথ এই কথা তখন বলেছিলেন, যার তিন বছর আগে ১৯২৮ সালে ভূস্বামী সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে গরিব চাষী, বর্গাদার, সামগ্রিকভাবে কৃষকশ্রেণীর স্বার্থ একেবারে অবহেলা করে আইনসভায় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল পাশ হয়। আর এই আইন পাশ করায় সেই সমস্ত স্বরাজীরা, যারা অসহযোগের পর আইনসভায় যোগ দিয়েছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণের অভ্রান্ততা,

(আষাঢ়, ১৩৩৩) "আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের শুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরূপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারো বা আছে জামিদারি, কারো বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইনব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই।"[৬৭]

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্ম এক্ষেত্রে তাই পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। তিনি চেয়েছিলেন দেশের মানুষের উন্নতির মধ্যদিয়ে দেশকে তৈরি করতে। *সত্যের আহ্বান* প্রবন্ধে তিনি বলেছেন - "রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা।"[৬৮] - একথা যে কতখানি সত্য তা স্বাধীনতার

পঁয়ষট্টি বছর পরও আমরা প্রত্যহই অনুভব করি। রাষ্ট্র তৈরি না করেই রাষ্ট্রবিপ্লব এবং স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার ফল কি হতে পারে, বাংলায় তেভাগা আন্দোলন তা দেখিয়ে দিয়েছে, যে আন্দোলন পরাধীন ভারতে শুরু হয়ে ১৯৪৭- এর ১৫ আগষ্ট পেরিয়ে স্বাধীন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে গড়িয়েছে।

"ওরে জমিদারের চর আইস্যাছে কাড়ইয়া নিতে ধান,
ছাইরবো না ভাই ঘরের লক্ষ্মী দ্যাহে থাকতে প্রাণ।
জলে ভিজাইয়া, রোদে পুড়ইয়া, আনছি ঘরে লক্ষ্মী,
তোমরা থাইকো সাক্ষী।
তারেই আজ গায়ের জোরে লইতে আইছে ওরা-
এ ধান দিমুনা, এ লক্ষ্মী ছাড়ুম না দ্যাহে থাকতে প্রাণ
ও গো মা, আমরাও তো তোমারি সন্তান।" কিংবা
"ফান আমানি খেয়ে আমরা হাসিল করলাম বন,
উঁচু জমি সমান করলাম, হেসে উঠল ফসল।
আজ সে জমির মালিক আমরা নই
সেই ক্ষিধেও রইল
আর থাকার মধ্যে রইল শুধু নেই নেই।"[৬৯]

তেভাগা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে অনামা গীতিকারদের এ সমস্ত জনগানের আবেদন আজও বজায় থাকা যেন বিপরীত দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সে-সময়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারার যৌক্তিকতার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা *ঘরে-বাইরেতে* উপন্যাসের শিল্পরূপে প্রকাশিত।

- ৩ -

**৬.৩. নারীচেতনাবাদী পাঠে বিমলা** -

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার শিল্পরূপ *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে প্রতিফলিত হলেও এরই সাথে সাথে বিমলাকে কেন্দ্র করে নিখিলেশের জীবনাশ্রয়ী প্রেমতত্ত্বও অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত

হয়ে গেছে। সমালোচকের ভাষায় - 'ঘরে-বাইরের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দুইটি স্তর আছে - প্রথমটি রাজনৈতিক ও দ্বিতীয়টি সমাজনীতিমূলক।'[৭০] বিমলা তাকে স্বামীর আইডিয়া রূপে গ্রহণ করুক, নিখিলেশ তা চায় নি। শুধুমাত্র স্ত্রীর আর্কিটাইপের মধ্যে নয়, বরং সংসারের প্রাত্যহিক চাহিদার ঊর্ধ্বে বাইরের সীমাহীন পরিসরে ব্যক্তি বিমলার লোকোত্তর প্রেমকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে নিখিলেশ '... তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকন্নাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক।' (বিমলার আত্মকথা - প্রথম পর্যায়) - এখানে যে 'ঘরগড়া ফাঁকির' কথা বলা হয়েছে, তা আসলে স্বামীকে দেবজ্ঞানে পূজা করবার পুরুষতান্ত্রিক নির্মিতি। পুরুষতন্ত্রের রচিত 'ঘর' - এর মধ্যে বদ্ধ বিমলাকে তাই 'বাইরে' বের করতে চেয়েছে নিখিলেশ। উপন্যাসের গোড়ার দিকে দুজনের কথোপকথনে তা স্পষ্ট -

> "আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।
>
> কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায়?
>
> এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে - তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।
>
> খুব জানি গো খুব জানি
>
> মনে করছ জানি, কিন্তু জানো কি না তাও জান না।" (বিমলার আত্মকথা - প্রথম পর্যায়)

দাম্পত্য সম্পর্কে নিখিলেশের এই মনোভাব (Attitude) ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা আজকের দিনে নারীচেতনাবাদী পাঠে মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে।

### ৬.৩.১. বিমলা ঃ রবীন্দ্রনাথের প্রাগ্রসর চিন্তাধারার অভিজ্ঞান -

এই গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি খণ্ডিত আধুনিকতায় লালিত আমাদের নারীসংক্রান্ত চিন্তাধারা সেদিন কিভাবে গতি ও পশ্চাৎপরতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল।

'সতী স্ত্রী'র সমাজনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত। বিভিন্ন সময় স্ত্রী শিক্ষা বা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্ন আসলেও সতীত্বের প্রধান মানদণ্ড(Norms) - পতি ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষের চিন্তা পর্যন্ত না করা - তা আজও অটুট। ১২৮০ সনে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'আদর্শ সতী স্ত্রী' শিরোনামায় লেখা হয় -

> "এদেশে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই সংস্কার এই, যিনি আপনার স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষ মাত্রকেই পিতা সহোদর কিম্বা সন্তানের ন্যায় নির্মল চক্ষে দর্শন করেন, তিনি যথার্থ সতী।... ইহা সতী জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ, এবং ইহা ভিন্ন সতীত্ব অসম্ভব, ... ।"[৭১]

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদ যখন সমীকৃত হচ্ছিল, তখন নারীবিষয়ক চিন্তাধারায় প্রাচীন হিন্দু আদর্শের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে। ১৩১১ সনে বামাবোধিনী পত্রিকায় লেখা হয় - 'যে স্ত্রী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিকে হরিভাবদ্বারা ভজন করেন, তিনি পরলোকগামিনী হইয়া হরিরূপ পতির সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সর্বসুখ সম্ভোগ করেন।'[৭২]

এই যখন ছিল নারী-উদ্দিষ্ট পত্রিকায় নারীদের প্রতি বার্তা, তখন বঙ্কিমচন্দ্র অতি সন্তর্পণে *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫) ও *রজনী* (বঙ্গদর্শন, ১২৮১-৮২) তে প্রাচীন সংস্কারে আচ্ছন্ন আদর্শানুরাগী সমাজে নিষিদ্ধ প্রেমের উপস্থাপন ঘটিয়ে সতীত্বের আদর্শকে মহামান্বিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ এ ধরনের অবৈধ প্রেমকে প্রশ্রয় না দিলেও লক্ষণীয় প্রতাপ (চন্দ্রশেখর) ও অমরনাথ (রজনী) কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হন নি, যা সে সময়ের নিরিখে কিছুটা দুঃসাহসিকতারই পরিচয় দেয়। মৃত্যুপথযাত্রী প্রতাপ বলেছে, 'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী? এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালোবাসা বুঝিবে। কে বুঝিবে, আজি এ ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালোবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি - আমার ভালোবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্খা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এ অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিতেছে।' - এহেন প্রতাপের প্রেমের প্রতিও পরস্ত্রী শৈবলিনী 'সতী স্ত্রীর আদর্শ' বিস্মৃত হয়ে অনুরক্তি প্রকাশ করতে পারে নি। অনুরূপ

আদর্শ লক্ষ্য করা যায় অমরনাথ প্রসঙ্গে লবঙ্গলতার ক্ষেত্রেও। অমরনাথ ও লবঙ্গলতার সংলাপে যা স্পষ্ট। অমরনাথ জানতে চেয়েছে

'যদি তুমি কখন ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু - অণুমাত্র - স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্মে পতিত হইব।

অ। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই।

ল। না - যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্খী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই।'

*ঘরে-বাইরের* বিমলাও পরিণামে নিখিলেশের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করে প্রত্যাবর্তন করলেও শৈবলিনী, লবঙ্গলতা ও বিমলা এক নয়। সতীত্বের যে সংস্কার ছোটোবেলা থেকে মেয়েদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়, সেই সংস্কার নিয়ে পূর্বপ্রণয়কে পেছনে ফেলে শৈবলিনী ও লবঙ্গলতা প্রশ্নহীনভাবে সমাজনির্দিষ্ট সেই সংস্কারকেই পালন করে গেছে। অপরদিকে বিমলা সতীত্বের এই সংস্কার নিয়ে স্বামীগৃহে প্রবেশ করলেও এই সংস্কার থেকে সে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে ঘরের স্বামীকে দেখেছে এবং পরিণামে সে স্বামীপ্রেমের কাছে নয় বরং ব্যক্তি নিখিলেশের প্রেমকে উপলব্ধি করে তার কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে। হৃদয়রহস্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে বিবাহিতা নারী বিমলার আত্মকথা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় সেদিনের সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা পাঠকসমাজে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। *ঘরে-বাইরে* কেন্দ্রিক বিতর্ক যার প্রমাণ।

**৬.৩.১.১. গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ -**

নিখিলেশ যে মানসিতকা থেকে বিমলাকে বাইরের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার শাশ্বত প্রেম উপলব্ধি করতে চেয়েছে, চেয়েছে বিমলাকে যথার্থ সহধর্মিণী রূপে পেতে,

সেদিনের সমাজমানসে এই চাহিদাও ছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে ১২৮০ সনে বামাবোধিনী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল -

> "বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা এদেশের অশেষ উপকার হইয়াছে এবং সভ্যতার ফললাভে সকলেই কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু কৃতবিদ্য যুবকেরা এক বিষয়ে অত্যন্ত অসুখী হইয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীর নিকটে শান্তি পান না, ... যেখানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম সম্বন্ধে এত অনৈক্য ও বিভিন্নতা, সেস্থানে এইরূপ বিবাদ ও অসুখ আশ্চর্য্য নহে। স্বামীর মন জ্ঞানগিরির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, স্ত্রীর মন ভ্রম ও বাল্য সংস্কারের ভূমিতে হামাগুড়ি দিতেছে। স্বামী সেকস্‌পিয়ার ও মিলটনের ভক্ত এবং তাহাদেরই পুস্তক পাঠ করিতে তাঁহার সর্ব্বদা অভিরুচি। স্ত্রী লেখা পড়ার নাম শুনিলে খড়্গহস্ত হয় এবং পুস্তককে বিষজ্ঞান করেন। স্বামী রাজনিতী, বিজ্ঞান, বিলাতের ও ভারতবর্ষের দৈনিক ঘটনা এবম্প্রকার বিষয়ে কথোপকথন করিতে চান। স্ত্রী পাড়ার লোক কি কি তরকারি খান, কিরূপ বেশ পরেন এই সকল কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন।"[৭৩]

ভারতের বিশেষ করে বাংলার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ও তৎসম্পর্কিত মনোভাবের পরিবর্তন যে অবশ্যস্কাবী, তা রবীন্দ্রনাথ উপলস্কি করেছিলেন।

> "দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতই ভিন্ন আকার ধারণ করছে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মতো বোধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে ক্রমশ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা পরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যস্কাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে।"

এক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা ও ব্যক্তিমুক্তির গুরুত্ব অনুভব করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - 'অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে

বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরেজি যে জানে এবং ইংরেজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্ছে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর একজনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন। ... এইজন্যে আমাদের আধুনিক দাম্পত্যের অনেক প্রহসন এবং সম্ভবত অনেক ট্র্যাজেডিও ঘটে থাকে।"[৭৪] এখানে রবীন্দ্রনাথ যে 'অসবর্ণ বিবাহ' সংবাদ দিয়েছেন তার কারণ নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য হলেও আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অনুভব করি এর মূলে আছে দাম্পত্য সম্পর্কে আমাদের চেতনার গভীরে প্রোথিত সমন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, যা উনিশ শতকে অর্জিত আধুনিকতার পর্যায় অতিক্রম করে একবিংশ শতকেও বহমান। এভাবে দেখলে দেখা যায় নিখিলেশ অভ্রান্তভাবে দাম্পত্য সংকটের মূল কারণটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছে।

*ল্যাবরেটরি* (১৩৪৭) গল্পে নন্দকিশোর ও সোহিনীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আরও কিছুটা স্পষ্টবাদী -

> "লোকে হাসত যখন দেখত, উনি (নন্দকিশোর) স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, 'ও কি প্রফেসারি করতে যাবে নাকি'। নন্দ বলতেন, 'না, ও কে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়'। বলত, 'আমি অসবর্ণ বিবাহ পছন্দ করি নে। ... স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা গাটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"[৭৫]

নিখিলেশও 'ব্রতের মিল' করাতে চেয়েছে। যেটা না করানোর মাশুল গুনতে হয়েছিল *নষ্টনীড়* (১৩০৮) গল্পের ভূপতিকে। 'এনলাইটেনমেন্ট' এর প্রসাদধন্য ভূপতি তার নবলব্ধ চেতনায় 'পলিটিক্স একটা জ্যান্ত জিনিস' বলে উপলব্ধি করলেও জীবন্ত চারুকে লক্ষ্যই করে নি। এ কারণেই ভূপতি 'যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিন তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে

ধীরে যৌবনে পদার্পণ' করলেও তা ভূপতির নজরে পড়ে নি। সমাজ ও পলিটিক্স সচেতন ভূপতি দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তার 'এলিটিজমে'র পরিচয় দিলেও তার ঘরেই 'ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই' যার 'চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল,' সেই চারু সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্ধকারে আবদ্ধ থেকে দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল কি না, সে বিষয়ে খেয়াল থাকে না। খবরের কাগজের সম্পাদক ভূপতি 'ভারত গভর্মেন্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে' কি না, তা নিয়ে চিন্তিত হলেও ঘরের বধূ 'চারু অন্তঃপুরের সীমান্তদেশে আসিয়া' আটকে গেল কি না সে বিষয়ে চিন্তিত হয় না। চারুর প্রতি অমনোযোগের ফলে তাদের দেশাত্মবোধও যে পঙ্গু হয়ে যায়, আলোকপ্রাপ্ত ভূপতি তা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়েছে। নিখিলেশ এক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই আধুনিক। *ঘরে-বাইরে* যথার্থই এ কালের উপাখ্যান।

পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধে অভ্যস্ত বিমলা মনে করেছে 'তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান'। ভোর বেলা উঠে স্বামীর পায়ের ধুলো নেওয়ার পেছনে কোনো পুণ্য অর্জন নয়, বরং তার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল বিনা প্রশ্নে দেবজ্ঞানে স্বামী পূজার ব্রাহ্মণ্য আদর্শ, 'কিন্তু, নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয় - সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়'। এই অভ্যাসের ভালোবাসা নিখিলেশ চায় নি। সে চেয়েছে স্বামী নামক আইডিয়াকে নয়, বরং ব্যক্তি নিখিলেশকে ভালোবাসুক বিমলা। বিমলাকে সেই পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিখিলেশের যত আয়োজন। যেখানে 'পুরুষমানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া,' তখন 'এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানোর' অপবাদ সহ্য করেও 'একেবারে একেলে' নিখিলেশ চেয়েছে সংস্কারশাসিত বিমলাকে 'ঘর গড়া মিথ্যা' থেকে বাইরে বের করতে। এক্ষেত্রে তার যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল, তা নারীচেতনাবাদী পাঠে বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

**ক.** "একদিন বিমলকে বলেছিলুম তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে - সে ছিল ঘরগড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ

থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো? ... স্মৃতিসংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল।" (নিখিলেশের আত্মকথা - প্রথম পর্যায়)

**খ.** "আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই! ও যদি বলতে চায় 'না, আমি আমিই' তখনই আমি বলব, সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি! ওটা কি একটা সত্য! ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?" (নিখিলেশের আত্মকথা - দ্বিতীয় পর্যায়)

**গ.** বিমলা জানাচ্ছে, "দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ইচ্ছা হল আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকি" - নিখিলেশের এই ইচ্ছার পেছনে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো থেকে আধুনিক নগরে বিমলাকে প্রবেশ করানোর প্রচেষ্টা ছিল। *ঘরে-বাইরের* একটা রূপক যেন এখানেও আভাসিত। অথচ সামন্ততান্ত্রিক খাঁচায় বদ্ধ বিমলার মন গ্রামেই থেকে যেতে চেয়েছে, ছোটোরানীর গৌরবে। কিন্তু নিখিলেশ তাকে দিতে চেয়েছিল অন্যকিছু, যা ছোটোরানীর আসনের থেকেও মহার্ঘ্য, 'আমার স্বামী বলতেন, দরকার কী তোমার ঐ আসনের? ও ছাড়াও তো জীবনের আরো অনেক জিনিস আছে, তার দাম অনেক বেশি।' (বিমলার আত্মকথা - প্রথম পর্যায়)

**ঘ.** "তুমি তো আমাকে স্বয়ম্বর সভায় বেছে নাও নি, যেমনটি পেয়েছ তেমনি তোমাকে চোখ বুজে নিতে হয়েছে; কাজেই দেবত্ব দিয়ে আমাকে যতটা পার সংশোধন করে নিচ্ছ। দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ম্বরা হতে পার নি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্ছ।" (বিমলার আত্মকথা - তৃতীয় পর্যায়)

**ঙ.** বিমলার প্রতি বাড়ির বড়ো জা ও মেজো জা'র ঈর্ষা বিমলার মনে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু - এরূপ সংস্কার জাগালেও নিখিলেশ যথার্থ বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে এর পেছনে নারীর ওপর আধিপত্যবাদের প্রভাব লক্ষ্য করেছে, যা আজকের নারীচেতনাবাদী বিশ্লেষণের সমধর্মী। বিমলা জানাচ্ছে 'মনে আছে আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়োই ছোটো, বড়ো বাঁকা।

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীন - দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোটো, যেমন বাঁকা। সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলছে - দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন অধিকার তাদের আছে?' লক্ষণীয় সমগ্র উপন্যাসে এরা সমাজনির্মিত বড়ো জা ও মেজো জা হয়েই রয়ে গেছে, নিজস্ব কোনো নাম পায় নি।

সংস্কারশাসিত বিমলাকে বাইরের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় পরিণামে নিখিলেশ যে সফল হয়েছে, বিমলা চিনতে পেরেছে পিতৃতন্ত্রের প্রপঞ্চগুলিকে, পরিবর্তিত বিমলার উপলব্ধিজাত ভাষ্য তার প্রমাণ।

**ক.** "আমি লেখাপড়া করেছি, সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। এ কালের সঙ্গে যদি কোনো-একদিন আমার মোকাবিলা না হত তা হলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম - মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি সহজ কথা, এর মধ্যে বিশেষ কোনো-একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য আছে কি না সেটা এক মুহূর্তের জন্যে ভাববার দরকার নেই।" (বিমলার আত্মকথা - প্রথম পর্যায়)

**খ.** "এখনকার ভাবুক পুরুষেরা সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্যে যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে?" (বিমলার আত্মকথা - প্রথম পর্যায়)

**গ.** বিনা প্রশ্নে স্বামীকে দেবজ্ঞানে পূজা করার যে বিশ্বাস পিতৃতন্ত্রের কৌশলী সৃষ্টি, বিমলাও তার মা'র আদর্শে সেই বিশ্বাস নিয়ে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছিল, 'সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর!'-

বিমলার এই উচ্চারণ সব ঘটনা ঘটে যাবার পর। স্বামী নামক আইডিয়াকে পূজা করার ক্ষেত্রেও যে তর্ক ও ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় করা যেতে পারে এই বোধটি বিমলার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল বলেই উদ্ধৃত অংশদ্ধৃত এই কথাগুলি সে বলতে পেরেছে। পুরুষতন্ত্র দ্বারা উপনিবেশিকৃত নারীমনে এই ভাষা জাগতে পারে না, কেননা ভাষা তো শুধু ভাষা নয়, ভাষা আসলে আমাদের চেতনারই চিহ্নায়ক।

**ঘ.** যে বিমলা একদিন নিখিলেশের ঔদার্য্যকে দুর্বলতা জ্ঞানে অবজ্ঞা করেছিল, নবলব্ধ চেতনায় পরিবর্তিত সেই বিমলাই নিখিলেশের মহত্ব অনুভব করতে পেরেছে, 'এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।' (বিমলার আত্মকথা - প্রথম পর্যায়) বিমলার এই উচ্চারণের সাথে মিলিয়ে পড়া যায় রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি - 'অবলার দুর্বলতা পুরুষের ইচ্ছাতেই বলপ্রাপ্ত হয়েছে, এইজন্য যে পুরুষের পৌরুষ আছে স্ত্রীলোকের উপদ্রব সে বিনা বিদ্রোহে আনন্দের সহিত সহ্য করে, এবং সহিষ্ণুতায় তার পৌরুষেরই চর্চা হতে থাকে। যে দেশের পুরুষেরা কাপুরুষ তারাই নির্লজ্জভাবে পুরুষ-পূজাকে, পুরুষের প্রাণপণ সেবাকেই স্ত্রীলোকের সর্বোচ্চ ধর্ম বলে প্রচার করে; ... সেই দেশেই দেখাযায় আহারে বিহারে ব্যবহারে সকল বিষয়েই সুখ এবং আরাম কেবল পুরুষের, উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত কেবল স্ত্রীলোকের, তাই নিয়ে বেহায়া কাপুরুষেরা অসংকোচে গৌরব করে থাকে এবং তার তিলমাত্র ব্যত্যয় হলে সেটাকে তারা খুব একটা প্রহসনের বিষয় বলে জ্ঞান করে।'[৭৬] কিংবা ''যাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে, সে মানুষ হইয়া দেবতার পূজা গ্রহণ করিতে লজ্জা অনুভব করে এবং যদি পূজা পায় তবে আপনাকে সেই পূজার যোগ্য করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশে দেখাযায়, পুরুষ সম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লজ্জ ভাবে আস্স্কালন করে। যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশি। আজকাল স্ত্রীদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন। আজকাল নৈবেদ্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া

তাঁহাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে। কিন্তু পত্নীদিগকে পূজা করিতে শিখানো অপেক্ষা পতিদিগকে দেবতা হইতে শিখাইলে কাজে লাগিত।"[৭৭]

ঙ. বিমলা বলেছে - 'আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়।' কিংবা 'সত্য কথা বলব? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিৎ ছিল।' কিংবা 'বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখি, কিন্তু অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না। অন্তত তখন তো সেই রকমই ভাবতুম।' কিংবা 'কিন্তু তেজ বলে একটা জিনিস আছে - সেদিন আমার মনে হয়েছিল ঐ জায়গায় আমি যেন আমার।' লক্ষণীয় নিখিলেশ সম্পর্কে বিমলার এগুলো 'মনে হত' কিংবা বিমলা এগুলো ভেবেছিল। অর্থাৎ এখন মনে হয় না, বা নিখিলেশ সম্পর্কে বিমলা এগুলো এখন ভাবে না। বিমলার এই উত্তরণই নিখিলেশের কাম্য ছিল।

উপন্যাসের শুরুতেই বিমলার আত্মকথায় জানা যায় জীবনে একটা দুর্যোগ থেকে তার উত্তীর্ণ হবার কথা। তার মা'য়ের সতীত্বের যে আদর্শকে পাথেয় করে বিমলা দাম্পত্য জীবন শুরু করেছিল, পথে কালো মেঘ তাকে ঘিরে ধরলেও সেখান থেকে সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, 'মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ - শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। ... আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?' - অর্থাৎ বিমলার প্রথম আত্মকথাই ফ্ল্যাশব্যাকধর্মী, ঘটনা ঘটে যাবার পর তা ফিরে দেখা। দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মকথাও শুরু হয়েছে - 'আমার লজ্জা যে কোথায় গিয়েছিল তাই ভাবি' - এই স্বীকারোক্তি দিয়ে, যা ঘটনা ফিরে দেখার দিকে ইঙ্গিত করে। অপরদিকে ঘটনার পরিস্থিতি অন্তর্গত নিখিলেশ ও সন্দীপ সমকালে তাদের ডায়েরি লিখেছে। ফলত নিখিলেশ ও সন্দীপের আত্মকথার সাথে বিমলার আত্মকথার মনোভঙ্গি ও বর্ণনাভঙ্গিগত পার্থক্য স্পষ্ট।

বিমলার আত্মকথা তার পরিবর্তিত উপলব্ধি দ্বারা পরিশীলিত হওয়ার ফলে তার সন্দীপমুগ্ধতা ও প্রণয়োচ্ছ্বাসের মধ্যে ঘটনা পরবর্তী অনুশোচনা ও সেদিনের স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা এত নিশ্চিতভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছে। বিমলার উত্তরণের দিকটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত কারার ক্ষেত্রে এই রীতি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন সন্দীপ প্রসঙ্গে বিমলার বক্তব্য - 'এই শেষ কটি কথা তিনি যে কাকে বললেন তা ঠিক বোঝা গেল না। ... মনে করা যেতে পারত কবি বাল্মীকি যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অনুষ্টুপ উচ্চারণ করেছিলেন তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ বলে উঠলেন - কিংবা জনসাধারণের মনোহরণ-ব্যবসায়ে চিরাভ্যস্ত অভিনয়কুশলতার এই একটি আশ্চর্য পরিচয় দিলেন।' ঘটনার প্রায় অন্তিম পর্যায়ে বিমলা সন্দীপের যে অভিনয়কুশলতা ও অসাধারণ বাচিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে, সন্দীপের সেই পরিচয় বিমলার প্রথম পর্যায়ের আত্মকথাতেই প্রকাশিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের অসাধারণ শিল্পকুশলতায় বিমলার আত্মকথায় একই সাথে সন্দীপের প্রতি তার মুগ্ধতা ও সন্দীপের অসঙ্গত আচরণ, স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মোহ এবং এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা দুই-ই যুগপৎ উচ্চারিত হয়েছে।

**৬.৩.১.২. বাইরের ডাক যেদিন এল ঃ স্বদেশী আন্দোলন ও বিমলা** -

সেদিনের আলোকপ্রাপ্তবর্গ নারীর মধ্যে দেশের শিকড় আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে তাদের সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করেছিলেন। *গোরা* ও *ঘরে-বাইরে* উপন্যাস যার প্রমাণ। পঞ্চভূত গ্রন্থের *নরনারী* প্রবন্ধে (১২৯৯) স্রোতস্বিনী বলেছে - 'যদি বুঝিতে পারিতাম আমাদের কিছু করিবার আছে এবং কী উপায়ে কী কর্তব্যসাধন করা যায়, তাহা হইলে আর কিছু না হোক চেষ্টা করিতে পারিতাম।'[৭৮] অর্থাৎ নারীর মধ্যে বাইরে বের হবার ডাক সেদিন উপলব্ধ হলেও আমাদের দেশে নারীমুক্তির ধারাটি যেহেতু পাশ্চাত্যের মত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে অনিবার্যভাবে আসে নি, নারীর অগ্রগতি তাই নির্ভর করছিল পুরুষের উপর। বাইরে বেরোনোর তাগিদ অনুভূত

হলেও তাই বাইরের রাস্তাটি ছিল অজানা, যার জন্য নির্ভর করতে হয়েছিল পুরুষের উপর। সন্দীপ বিমলাকে নিজের প্রদর্শিত পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। অপরদিকে নিখিলেশ বিমলার মধ্যেই এমন একটি জাগরণ বা চেতনার বিকাশ দেখতে চেয়েছিল যাতে বিমলা নিজেই নিজের পথ স্থির করতে পারে। এইভাবে দেখলে বিমলার মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির কোন দিকটিকে ধরতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যায়।

বিমলার প্রথম পর্যায়ের আত্মকথা থেকে জানা যায়, নিখিলেশ যখন বিমলাকে বাইরের জগতের মধ্যে মুক্তি দিতে চাইছিল, তখন স্বদেশীর রথে চড়ে বিমলার জীবনে সন্দীপের প্রবেশ ঘটে। স্বদেশীর উন্মাদনা বিমলাকেও মাতাল করে তোলে। স্বদেশী ও তার পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ইতিহাস সমর্থিত -

> "মুক্তি সংগ্রামে মহিলারা যোগ দিতে শুরু করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে। ক্রমে ক্রমে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ... স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের ক্ষেত্রে বাংলার মেয়েদের বিশেষ অবদান ছিল।"[৭৯]
>
> "... যে স্বদেশী আন্দোলন জাগ্রৎ হল সেখানে মহিলারা তাঁদের পর্দাকে ফেলে দিয়ে সরাসরি খোলাখুলিভাবে যোগ দিলেন। ... যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল ব্যাপকভাবে। দলে দলে তরুণরা যোগ দিতে শুরু করলেন। কিন্তু মেয়েরাও পিছিয়ে রইলেন না।"[৮০]

বিমলা জানিয়েছে -

> "বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল, কিন্তু সে যে কেমনকরে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই। বোধ করি সেইজন্যেই নূতন যুগ একেবারে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো আমাদের ভয়-ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কী হল, কী হবে, তা বোঝার সময় পাই নি।

পাড়ায় বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত দেশের বর আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে? হুলু দিতে দিতে, শাঁক বাজাতে বাজাতে, তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে।"

বিমলার এই উচ্চারণ স্বদেশী আন্দোলনে তার যোগদানের সাক্ষ্যই শুধুমাত্র দেয় না, তার সামজতাত্ত্বিক বোধেরও পরিচয় দেয়, যে বোধ তার অধিগত হয়েছে সমগ্র ঘটনা ঘটে যাবার পর। স্বদেশী আন্দোলনে ও তার পরবর্তী সময়ে অসহযোগ আন্দোলনেও যে বিপুলসংখ্যক মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছিল, তারা কতটা রাজনীতি সচেতন ছিল - আজকের দিনে সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। মাত্র কয়েক বছর আগে ১৮৯১ সনে 'Age of Conscnt' বিল নিয়ে যে সমাজে প্রবল বিরুদ্ধ জনমত তৈরি হয়, সেই সমাজ থেকে কয়েক বছর পর যে নারীরা সমস্ত অবরোধ রাতারাতি অতিক্রম করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়, তারা রাজনৈতিক চেতনাগত দিক দিয়ে কতটা প্রস্তুত ছিলেন, সে প্রশ্ন জাগাটা অস্বাভাবিক নয়। বিমলার আত্মকথা অন্তর্গত উদ্ধৃতাংশে 'তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই,' - ধারাবাহিকতা পরিহার করে ইতিহাসের উল্লম্ফনের (Jumping) দিকেই ইঙ্গিৎ করে না কি! এ-কারণেই কি বিমলা স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেও 'কী হল, কী হবে, তা বোঝবার সময়' পায় নি! কিংবা 'দূর দিগন্তের ডাক' শুনলেও 'স্পষ্ট তার মানে বুঝতে' না পারলেও 'মন উতলা হয়ে' উঠেছিল! সেদিনের সেই রাজনৈতিক অসচেতনতার ফলেই কি স্বাধীনতার মাত্র আট বছর পর জনৈকা পত্রিকা সম্পাদিকা গভীর নৈরাশ্যে লেখেন,

"কিন্তু তরী যেন কোথায় ঠেকে গেল! ঘর ছেড়ে যারা বেরুলাম দীর্ঘ আট বছরেও তারা আর ঘর বেঁধে উঠতে পারলাম না। নিরন্ন যারা ছিলাম অন্ন তাদের এখনও

জুটলো না। ... কাজ পাওয়া না তো যেন স্বপ্ন সত্য হওয়া! স্বাধীনতার কোনো কল্যাণস্পর্শ তো জীবনের দরজায় এসে ঘা দিল না।"[৮১]

স্বদেশী, অসহযোগ ও আগস্ট আন্দোলনে দলে দলে নারী অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসে যোগদান করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পর এই নারীসমাজই পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চাইলে এই সমাজ থেকেই প্রবল আপত্তি ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে নিত্যব্যবহার্য জিনিসের মূল্য যখন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা পরিবারের উপার্জন বাড়াবার উদ্দেশ্যে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চাইল। "কিন্তু যে সমস্ত কাজে তখন একমাত্র পুরুষদেরই প্রবেশাধিকার ছিল তাতে যোগ দিতে গিয়ে রক্ষণশীল সমাজের কাছ থেকে তাঁদের জুটল চরিত্রহীনের কলঙ্ক। কর্মক্ষেত্রে বহু স্থানে তখনও তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল না। পুরুষের থেকে বেশি পরিশ্রম করেও তাঁদের উপার্জন ছিল তুলনায় কম।"[৮২] - এই যখন ইতিহাস এবং এখনও যখন আইনসভায় The Constitution 108 Amendment Bill (Womens Reservation Bill) আটকে থাকে, তখন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, শান্তি, সুনীতি, উজ্জ্বলা - এই সাহসী নামগুলি স্মরণে রেখেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পুনঃপাঠের দাবি রাখে। মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে বিমলার উপলব্ধি -

"কিন্তু এ যে সব ছড়ানো, এ যে সৃষ্টিকর্তার মুঠোর ফাঁক দিয়ে কেবলই গলে গলে পড়ে, ... অথচ সেই জিনিস হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের আঙিনার কাছে এসে মেঘগর্জনে বলে উঠল ঃ অয়মহং ভোঃ!

তাই আমাদের সেদিন মনে হল, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্তমান মুহূর্ত কোনো সুধারসোন্মত্ত দেবতার মুকুটের থেকে মানিকের মতো একেবারে আমাদের হাতের উপর খসে পড়ল; আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের এই বর্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারম্পর্য নেই। এ দিনটি আমাদের সেই ওষুধের মতো যা খুঁজে বের করি নি, যা কিনে আনি নি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের

স্বপ্নলস্ক। ... আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল, ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পকরথের মতো সে আপনি চলে আসে। অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাইনে দিতে হয় না, তার খোরাকির জন্য কোনো ভাবনা নেই ...।" (বিমলার আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়)

সন্দীপের প্রতি বিমলার প্রাথমিক আকর্ষণের ভিত্তি রচনা করেছে বিমলার প্রতি সন্দীপের অত্যুক্তি। 'একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে' বিমলা সে সময় ভেবেছে - 'এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোটো নদী - তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা - কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে গেল ... আমাকে কি বিধাতা আজ একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করলেন? যে ছিল সামান্য সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশের গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলেন। ... সন্দীপবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমাকে যেন সমস্ত দেশের ভারি দরকার। ... ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা কিছু কাজ চলছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।' (বিমলার আত্মকথা - দ্বিতীয় পর্যায়) এ-সময় সন্দীপের প্রতি বিমলার যে মনোভাব তাকে ঠিক অনুরাগ বলা যায় না, বরং সন্দীপের প্রতি বিমলার মনে একটা সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম লক্ষ্য করা যায়, 'সন্দীপবাবু তো কেবল একটি মাত্র মানুষ নন, তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্তধারার মোহনার মতো। তাই, তিনি যখন আমাকে বললেন, মউচাকের মক্ষীরানী, তখন সেদিনকার সমস্ত দেশসেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হয়ে গেল।' (বিমলার আত্মকথা - দ্বিতীয় পর্যায়) কিংবা 'আমি গোড়ায় সন্দীপবাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম।' (বিমলার আত্মকথা - তৃতীয় পর্যায়)

বিমলাকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করার ক্ষেত্রে সন্দীপ স্বদেশীকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাই বিমলার আত্মকথায় জানা যায় - 'কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার আলোচনা মডার্ন কালের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ এবং অন্য হাজার রকমের কথা। তারই

ভিতরে ভিতরে ইংরেজি কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার আমদানি; সেই সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সুর লাগানো চলছে যেটা হচ্ছে খুব মোটা তারের সুর।' (বিমলার আত্মকথা - তৃতীয় পর্যায়) বিমলার দিক থেকে কোনো রকমের পিছুটানের সম্ভাবনা তৈরি হলেই সন্দীপ স্বদেশীকে ব্যবহার করেছে। দু-দিন বিমলার দেখা না পেয়ে সন্দীপ তার সংক্ষিপ্ত চিঠিতে বিমলার উদ্দেশ্যে লিখেছে - 'বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ।' বিমলার পরবর্তী উপলব্ধিতে স্বদেশী দ্বারা তার ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে - 'সমস্ত দেশের উপর এই যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। ... দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল।' (বিমলার আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়)

সন্দীপের প্রতি তার আকর্ষণটা যে একটা মদের নেশার মতো, যা তাকে তিলে তিলে ক্ষয় করে দিচ্ছে, বিমলা তা বুঝতে পেরেছে। অথচ মদ্যাসক্তের মতো এই আকর্ষণ থেকে অন্তর থেকে বিমলা মুক্ত হতে চায় নি, 'যে নেশায় আমাকে পেয়েছে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারি নে। ... এ মদ কিনে আনতে হয় না, গ্লাসে ঢালতে হয় না - রক্তের ভিতর থেকে আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠছে।' (বিমলার আত্মকথা - তৃতীয় পর্যায়) নেশার এই প্রাবল্যের জন্যই বিমলা দু-দিন সন্দীপের সাথে দেখা না করলে বিমলার মনে হয়েছে - 'কার জন্যে যেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে, যেন সমস্ত গায়ের রক্ত বাইরের দিকে কান পেতে রয়েছে।'

স্বদেশীর সেদিনের উন্মাদনায় গা ভাসিয়ে দিয়ে সন্দীপের প্রশস্তির ফলে বিমলা নিজের মধ্যে দেশের শক্তির উৎস অনুভব করে অজানার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করেছিল, 'আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটা মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে, আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে; একটা দীপ জেবলে নেবারও সবুর তার সয় নি।' কিংবা

'এ-সব কেবলই শুনতে শুনতে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ করছি তাকেই নূতন করে সৃষ্টি করছি ... নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়েই আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম, ভক্তকে আমি বরদান করব। আর এও আমার মনে ছিল, আমি যা চাইব তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।' (বিমলার আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়) নিজের ঘর থেকে গিনি চুরি করার পর অনুতাপে দগ্ধ মানসিক দ্বন্দ্বদীর্ণ বিমলা সন্দীপের স্তুতিবাদের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজেছে - '... আমার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেছি কিছু ছিল না কি? ছিল বৈকি। সেই খবর তো সন্দীপের কাছেই শুনেছিলুম, ... আমি আলো দেব, আমি জীবন দেব, আমি শক্তি দেব, আমি অমৃত দেব, সেই বিশ্বাসে সেই আনন্দে দুই কূল ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিলুম। ... সন্দীপের প্রণাম যখন পেলুম আমার চুরি তখন মহিমান্বিত হয়ে উঠল। টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোক নিন্দাকে, ধর্মবুদ্ধির সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা করে ঝক্ ঝক্ করে হাসতে লাগল।' (বিমলার আত্মকথা - পঞ্চম পর্যায়) বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব যত তীব্র হয়েছে, নিমজ্জমান দশা থেকে পরিত্রাণের জন্য ততই সে সন্দীপের স্তবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে, 'আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে; কেবলই মনে হয় সন্দীপের কাছে গিয়ে আপনার স্তব শুনি গে। আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে; সেখান থেকে যেখানেই পা বড়াই সেইখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি ঐ বেদী আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই, দিনরাত্রি স্তব চাই। ঐ মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হতে থাকলেই আমি আর বাঁচি নে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে; আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার।'

সন্দীপের স্তুতিবাদে আচ্ছন্ন বিমলা অমূল্যর স্নেহস্পর্শে ও সন্দীপের ক্রম অধঃপাতের অভিঘাতে ক্রমশ তার নিজের বিনষ্টি উপলব্ধি করলেও পরিণামে নিখিলেশের কাছে বিমলার প্রত্যাবর্তন আকস্মিক ভাবে ঘটে নি। এক্ষেত্রে মানসপরিবর্তনের এই সন্ধিস্থলে বিমলার দ্বিধাময়

চৈতন্যের একটি স্তর অঙ্কণ রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ চরিত্রচিত্রণ শক্তির পরিচায়ক। যে আভ্যন্তর দ্বিধা থেকে বিমলার মনে হয়েছে - 'কিছুদিন থেকে বারে বারে মনে হচ্ছে আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে, সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ংকর; আর এক বুদ্ধি বলছে, এই তো মধুর।' এই দ্বিধাময় চৈতন্য থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ছিল সন্দীপের স্থূলতার, তার স্তুতিবাদ ও অভিনয়কুশলতার অনাবরণ উন্মোচন। এই শিল্পগত প্রয়োজনে নিখিলেশ সন্দীপকে চলে যেতে বলার আগেই তাই সন্দীপ সম্পর্কে বিমলার মোহভঙ্গের সূচনা হয়ে গেছে। সন্দীপের আসল চরিত্র বিমলার কাছে 'একেবারে আগুনের মতো নগ্ন' হয়ে প্রকাশ পাওয়ার পর বিমলার উপলব্ধি সন্দীপের মোহপাশ থেকে তার সম্পূর্ণ মুক্তির সাথে সাথে নিজের নবার্জিত আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার ইঙ্গিত দেয় - 'দুর্বল, দুর্বল! এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেছে, ও আমার কাছে দুর্বল। তাই হঠাৎ এই অসংযত রাগ। ও বুঝতে পেরেছে, আমার যে শক্তি আছে তার সঙ্গে জোরজবরদস্তি খাটবে না, আমার কটাক্ষের ঘায়ে ওর দুর্গের প্রাচীর আমি ভেঙে দিতে পারি। সেইজন্যেই আজ এই আস্স্কালন। আমি একটা কথা না বলে একটুখানি কেবল হাসলুম। এতদিন পরে আমি ওর উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছি; আমার এ জায়গাটুকু যেন না হারায়, যেন না নাবি।' (বিমলার আত্মকথা - পঞ্চম পর্যায়)

বিমলা যতই সন্দীপের স্থূলতার পরিচয় পেয়ে তার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, বিমলার প্রতি তার শক্তি যখন থেকে 'ভালো করে খেলবার আর জায়গা' পায় নি, অসংযমী সন্দীপ তখন থেকে নিজেকে আর তার প্রসাধিত আবরণের মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে নি, 'সেই জন্য সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্তি' থাকে নি। 'ওর কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ' লেগেছে। যে সন্দীপের স্তব বিমলাকে 'দেশের শক্তির উৎস' করে তুলেছিল একদিন, সেই সন্দীপই বিমলার মধ্যে 'মেয়েলি ছলাকলা' দেখতে পাওয়ায়, তা বিমলাকে এক নিমেষে যেন ভাবের স্বর্গ থেকে কঠিন মর্তে নামিয়ে এনেছে, 'দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে অমন করে ফস্কে যাবার চেষ্টা কোরো না। এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজ আগে হয়ে যাক, তার

পরে তোমাদের ঐ মেয়েলি ছলাকলা-বিস্তারের সময় হবে। তখন সেই লীলায় আমিও যোগ দেব।' (বিমলার আত্মকথা - পঞ্চম পর্যায়) সন্দীপের এই উক্তিতে লক্ষণীয় 'তোমরা' সর্বনামের ব্যবহার। যে বিমলা এতদিন ছিল 'তুমি' অর্থাৎ বিশেষ, সেই বিমলাই আজ সন্দীপের উচ্চারণে 'তোমাদের' ভিড়ের মধ্যে স্থান পেয়েছে। এই ভাবে দেখা যায়, যে সন্দীপ বিমলাকে বাইরে বের করে এনেছিল, সেই সন্দীপই তার বিপরীত রকম আচরণের দ্বারা বিমলাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছে। যদিও যে বিমলা বেরিয়ে এসেছিল এবং যে বিমলা ফিরে গেল - দুই বিমলা এক নয়। নবলব্ধ চেতনায় ঋদ্ধ বিমলার উপলব্ধিতে তার এই আত্ম-অতিক্রমণের মর্মন্তুদ সত্য উদ্‌ঘাটিত -

> 'আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,
> যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই।' (বিমলার আত্মকথা - সপ্তম পর্যায়)

- ৪ -

**৬.৪. 'জলের থেকেও ছিঁড়ে গিয়ে জল - আবার যেমন জোড়া লাগে জলে'** -

*ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে স্বদেশী যুগের রাজনীতির সাথে অবিমিশ্রভাবে জড়িয়ে আছে নর-নারীর সংকটাপন্ন সম্বন্ধ। রাজনীতি না চরিত্রের সংকট, *ঘরে-বাইরে* রাজনৈতিক উপন্যাস কি না, কিংবা রাজনীতি ও ব্যক্তিত্বের সংকটের এই যুগলবন্দি উপন্যাসের শিল্পসীমা অতিক্রম করেছে কি না, এতদ্বিষয়ক বিতর্কের উল্লেখ সংক্ষিপ্তাকারে এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য যেহেতু উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদী ও নারীচেতনাবাদী পাঠকের অবস্থান থেকে রবীন্দ্র-উপন্যাসের পুনঃপাঠ, তাই *ঘরে-বাইরে* কেন্দ্রিক উল্লিখিত বিতর্কধারার সবগুলো আমাদের আলোচনার গণ্ডিভূক্ত নয়। এখানে আমরা লক্ষ্য করব, *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে স্বদেশমুক্তি ও ব্যক্তিমুক্তির প্রশ্নটি কিভাবে উপন্যাসের শিল্পসীমা অতিক্রম না করেও একে অপরের পরিপূরক হয়ে অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে *ঘরে-বাইরের* প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্যটিকেও বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

**৬.৪.১. প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য ঃ এর প্রয়োজনীয়তা** -

*চতুরঙ্গ*র পর *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করেছেন। তবে *চতুরঙ্গ*তে যেমন কথক শ্রীবিলাসের একক জবানিতে কাহিনী বিবৃত হয়েছে, *ঘরে-বাইরে*তে সেরকম একক দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয় নি, উপন্যাসটিতে তিনটি চরিত্রই কথকের ভূমিকা নিয়েছে। *ঘরে-বাইরে*র আঙ্গিক প্রসঙ্গে তাই বঙ্কিমচন্দ্রের *রজনী* উপন্যাসের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য, *ঘরে-বাইরে*র মতো *রজনী*তেও একাধিক চরিত্রের আত্মকথনরীতি ব্যবহৃত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বিশেষ রীতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য এক ছিল না। *রজনী*র যা বিষয়, তা সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবৃত হতে পারতো। একাধিক চরিত্রের কথনরীতির ব্যবহার এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসজগতে একটি পরীক্ষামূলক বৈচিত্র্য এনেছে। অপরদিকে *ঘরে-বাইরে*র যা বিষয়, তার যথাযথ রূপায়ণের জন্য অনিবার্যভাবেই রবীন্দ্রনাথকে সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ পরিহার করতে হয়েছে। ব্যক্তিসত্তার নিভৃতরহস্য উন্মোচন ও রাষ্ট্রিক সংকট বিষয়ে ব্যক্তিগত উপলব্ধির উন্মোচনের অনিবার্য প্রয়োজনেই *ঘরে-বাইরে*তে আত্মকথনরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর বিশ্লেষণে আমাদের ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় - 'বঙ্কিমচন্দ্রের রজনীতে আপাতদৃষ্টিতে এরই (ঘরে-বাইরে) সদৃশ একাধিক চরিত্রের আত্মকথনরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু রজনীর আত্মকথনরীতির দ্বারা ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সংকটের গভীরতা আদৌ তেমন প্রকাশ পায় নি, মুখ্যত প্রকাশ পেয়েছে নানা আকস্মিক ঘটনার মালা-গাঁথা চমকপ্রদ এক কাহিনী-সংকট।'[৮৩]

বক্তব্যের গভীরতার প্রয়োজনেই যে *চতুরঙ্গ*তে রবীন্দ্রনাথ সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তে উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটি বিবৃত করেছেন, তা *চতুরঙ্গ*র আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসটিও উত্তমপুরুষের জবানিতে বিবৃত হলেও এক্ষেত্রে তিনটি প্রধান চরিত্রের ডায়েরি আঙ্গিকের মাধ্যমে ব্যবহৃত দৃষ্টিকোণ বৈচিত্র্য এনেছে। শুধুমাত্র বৈচিত্র্য সৃষ্টি বা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ *চতুরঙ্গ*তে একজনের এবং *ঘরে-*

*বাইরেতে* তিনজনের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেন নি নিশ্চয়। বরং আঙ্গিকের এহেন নূতনত্ব সৃষ্টির পেছনে ছিল আরও গূঢ়তর কোনো প্রয়োজন।

কি এই প্রয়োজন। সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকে দূরে রেখে উপন্যাসের কোনো একটি চরিত্রের আত্মস্মৃতিকথনের মাধ্যমে উত্তমপুরুষের একক জবানিতে সমগ্র উপন্যাস বিবৃত করার যে সীমাবদ্ধতা আছে, *চতুরঙ্গর* পর রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যক্তিসত্ত্বার নিভৃত নিগূঢ় রহস্যের উন্মোচনে ঔপন্যাসিক সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ পরিহার করে উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নিলেও কথক যেহেতু একজন, তার চেতনার মধ্যদিয়ে পরিস্রুত হয়ে আসা ঘটনাই যেহেতু পাঠকের কাছে পৌঁছায়, যা চরিত্রে একমাত্রিক (Monotonic) এবং একজনের পক্ষে যেহেতু প্রতিটি ঘটনা সহ ঘটনার পেছনের কারণ জানা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় প্রতিটি চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা, (চতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রকরণগত এই সমস্যার সমাধান করেছেন শচীশের ডায়েরির সাহায্যে কিংবা 'পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না' ধরনের কৈফিয়ৎ শ্রীবিলাসের মুখে বসিয়ে) একাধিক চরিত্র কথক হলে, একাধিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ঘটনায় আলোক প্রক্ষিপ্ত হলে এই সমস্যার একটা সমাধান হয়ে ওঠে।

*ঘরে-বাইরেতে* তিনটি চরিত্রই তাদের ভাষা বিশ্লেষণ ও আত্মদর্শন পাঠকের সামনে সরাসরি উপস্থাপন করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার প্রেক্ষাপটে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল বিন্যাস ঘরে-বাইরে উপন্যাসে বিধৃত। এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন, নিছক স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দাম্পত্য এবং নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতাই যদি শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইতেন, তবে চতুরঙ্গর মতো একক কথকের দৃষ্টিকোণের ব্যবহার কি খুব একটা অন্তরায় হত। সেই অন্তরায় কি দূর করতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথের মতো কথাশিল্পী, ভাষা দিয়ে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ক্ষমতা যাঁর ছিল কল্পনাতীত। কিংবা কারো ডায়েরি ব্যবহার করে (যেমন শচীশের ডায়েরি ব্যবহার করেছিল

শ্রীবিলাস) কি একক কথকের দৃষ্টিকোণ জনিত এই সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ সম্ভব ছিল না। বিশেষত বিমলার মধ্য দিয়ে এ ধরনের জমি কিছুটা প্রস্তুত হয়েই ছিল। কেননা নিখিলেশ ও সন্দীপের ডায়েরি যেখানে ঘটনা ঘটার অব্যবহিত পরে লেখা, অর্থাৎ তাৎক্ষণিক ঘটনাকেই এরা বিবৃত করেছে, অপরদিকে বিমলার বক্তব্য অনেকটাই স্মৃতিকথার ঢঙে বিবৃত। সমগ্র ঘটনা ঘটে যাবার পর বিমলার আত্মকথা শোনা গেছে। উপন্যাসটি শুরু ও শেষও হয়েছে বিমলার আত্মকথা দিয়ে। তবে কেন রবীন্দ্রনাথ তিনজনের আত্মকথনরীতি ব্যবহার করলেন, নিজের সাথে একমাত্র নিজের ছাড়া যেখানে আর কারো কথা নেই। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দাম্পত্য সংকট চিত্রিত করা লেখকের উদ্দেশ্য থাকলেও[৮৪] স্বদেশী আন্দোলনের সংকট ও সীমাবদ্ধতার দিকটিও হয়তো লেখকের অগোচরেই বেশি জায়গা পেতে চেয়েছে। তাই কেবল পাত্র-পাত্রীর হৃদয়রহস্য উন্মোচনই নয় তীক্ষ্ণ আত্মসমীক্ষা, ন্যায়-অন্যায়বোধ, আদর্শ ও সুবিধাবাদের উন্মোচনের তাগিদে অনিবার্যভাবেই তিনটি চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহৃত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতাবলম্বী নিখিলেশকেও একজন বিবৃতিকার করা হয়েছে। সন্দীপের আত্মকথায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আন্দোলনের বিপজ্জনক প্রবণতা। কিংবা বিপরীত দিক দিয়ে বলা যায়, হয়তো তিনজনের আত্মকথার সুযোগে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা তার অজান্তেই উপন্যাসটিতে অধিক জায়গা পেয়েছে।

*ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে ব্যক্তিমুক্তি ও রাজনৈতিক মুক্তির ধারণা কিভাবে একে অপরের সাথে অনন্যসম্পৃক্ত হয়ে আছে সেদিকে দৃষ্টি দেবার পূর্বে উপন্যাসটির প্রকরণগত অন্য একটি বিশেষত্বর দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। উপন্যাসটিতে তিনজনের আত্মকথা উচ্চারিত হওয়ার ফলে ঘটনার পুনরাবৃত্তিজনিত যে শিল্পগত ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে, রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য শিল্পকুশলতায় *ঘরে-বাইরে* - এই দোষ থেকে মুক্ত। তিনজনের আত্মকথনরীতি ব্যবহৃত হওয়ার ফলে অন্তত দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে -

**এক.** প্রতিটি ঘটনা ত্রিমাত্রিক আলোকসম্পাতে সমুজ্জ্বল হয়েছে, এবং

**দুই.** প্রতিটি চরিত্র সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে অপরাপর চরিত্রের মনোমুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়ে।

**এক.** *ঘরে-বাইরে*তে পরিস্থিতি ও ঘটনার নিজস্ব ভূমিকা গৌণ, বরং পরিস্থিতি ও ঘটনার অভিঘাত চেতনাপুঞ্জে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেটাই মুখ্য হওয়ায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলেও তা ত্রিমাত্রিক আলোকসম্পাতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেমন, অপরাধবোধে দীর্ণ বিমলা রাতের অন্ধকারে বারান্দায় নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলে নিখিলেশ বিমলার কাছে গেলে এবং দুজনের মধ্যে কোনো কথা না হলেও দুজনের আত্মকথায় এই ঘটনার দুই রকম মানস-প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। নিখিলেশের ষষ্ঠ পর্যায়ের আত্মকথায় আছে -

> "আমার ঘরে আর কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো-একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি বিমলা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। ...
>
> একবার ভাবলুম ফিরে যাই। কিন্তু পারলুম না। নিঃশব্দে বিমলার শিয়রের কাছে বসে তার মাথার উপর হাত রাখলুম। প্রথমটা তার সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠল, তার পরেই সেই কঠিনতা যেন ফেটে ভেঙে কান্না সহস্রধারায় বয়ে যেতে লাগল। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এত কান্না যে কোথায় ধরতে পারে সে তো ভেবে পাওয়া যায় না। আমি আস্তে আস্তে বিমলার মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম। তার পরে কখন এক সময়ে হাৎড়ে হাৎড়ে সে আমার পা-দুটো টেনে নিলে, বুকের উপর এমনি করে চেপে ধরলে যে আমার মনে হল, সেই আঘাতে তার বুক ফেটে যাবে।"

বিমলার আত্মকথায় এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলেও তা ভিন্ন চেতনালোকের পরিচয়বাহী -

> "মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লগলুম, ... এমন সময় পায়ের শব্দ শুনলুম। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। কে বলে, দেবতা দেখা দেন না! আমি মুখ তুলে চাইলুম না, পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সইতে না পারেন। ... আমার শিয়রের কাছে এসে বসলেন। কে? আমার স্বামী! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না। মনে হল মূর্ছা

যাব। তার পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম; ঐ পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মতো ঐখানে আঁকা হয়ে যায় না কি?" (বিমলার আত্মকথা - ষষ্ঠ পর্যায়)

বিমলা দু-দিন সন্দীপের সাথে দেখা না করলে, বিমলা ও সন্দীপের আত্মকথায় এই ঘটনার দু-রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে।

**দুই.** *ঘরে-বাইরের* তিনটি চরিত্র তাদের আত্মকথায় একে অপরের বিষয়ে মূল্যায়ন করায় প্রতিটি চরিত্র সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে অপর চরিত্রের চেতনালোকে প্রতিবিম্বিত হয়ে দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায়। যেমন বিমলা তার আত্মকথায় নিজের সম্পর্কে বললেও সে নিখিলেশ ও সন্দীপের সম্পর্কেও বলেছে। অনুরূপভাবে সন্দীপ তার আত্মকথায় শুধু নিজের প্রকৃতির পরিচয়ই দেয় নি, সে বিমলা ও নিখিলেশকে কি চোখে দেখে তার পরিচয়ও দিয়েছে। যেমন নিখিলেশ নিজের কথার পাশাপাশি বিমলা সম্পর্কে যা লিখেছে, তা বিমলাকে বোঝার জন্য মূল্যবান -

"আজ পর্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারে নি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না; ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা কত সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্যের পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমনকি, অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে।"

অনুরূপভাবে সন্দীপ সম্পর্কে নিখিলেশের মূল্যায়ন সন্দীপের প্রকৃতিকে বুঝবার জন্য মূল্যবান -

"আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি, সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল অসক্তিই তাকে ধর্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে। তার প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বলেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড়ো নাম দিয়ে সাজিয়ে তোলে। ভোগের তৃপ্তির মতোই বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার পক্ষে উগ্ররূপে দরকারি। টাকা সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে ...।"

### ৬.৪.২. রাজনৈতিক মুক্তি ও ব্যক্তিমুক্তি প্রসঙ্গে সন্দীপ ও নিখিলেশ -

*ঘরে বাইরে* উপন্যাসে ব্যক্তিমুক্তি ও স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে অনন্যসম্পৃক্ত হয়ে আছে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। 'এ-কালের মানুষ' নিখিলেশ চেয়েছে বিমলাকে বাইরের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। শাস্ত্রশাসিত বিমলাকে স্ত্রীরূপে নয়, বরং ব্যক্তি বিমলাকে সহধর্মিণী রূপে পেতে চেয়েছে নিখিলেশ। নিখিলেশ যে সময় সংস্কারশাসিত বিমলাকে বাইরের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছিল, তখনই স্বদেশী আন্দোলনের দামামা বেজে ওঠা এবং সন্দীপের বাক্‌চাতুর্যে বিহ্বল বিমলার রাজনীতির সাথে ততটা নয়, যতটা সন্দীপের সাথে জড়িয়ে পড়া এবং পরিণামে নিখিলেশের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করে বিমলার প্রত্যাবর্তন - শুধুমাত্র এইটুকুর মধ্যেই ব্যক্তিমুক্তির সাথে রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিধৃত হয়ে আছে - এমন নয়। এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করব সন্দীপ ও নিখিলেশ দুজনেই কিভাবে তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুযায়ী বিমলার মধ্যদিয়ে নারীমুক্তির কথা ভেবেছে।

#### ৬.৪.২.১. সন্দীপের অবস্থান -

বিমলার দিক দিয়ে স্বামী নিখিলেশ তার ঘর, পরপুরুষ সন্দীপ বাহির। আবার স্বামী সম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ বিমলার ঘর, যা থেকে বেরিয়ে বাইরের পুরুষের দিকে সে আকর্ষণবোধ করেছে, সেই বাইরের পুরুষের আত্মকথায় - 'এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্রলোকের মানুষ'। (সন্দীপের আত্মকথা - দ্বিতীয় পর্যায়)। বিমলার মধ্যে ঘর ও বাইরের এই সংকট উপন্যাসের নামকরণে আভাসিত। তবু অন্যান্য অনেক নরীর মতো বিমলাও সেদিন স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল - যা ইতিহাস সমর্থিত। যদিও "আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে এক প্রবল হিন্দু হাওয়া লক্ষ্য করা যেত - যেখানে নারীকে একই সঙ্গে 'দেশমাতা' অন্যদিকে পুরুষের 'প্রাণশক্তি' হিসাবে অভিহিত করা হতে থাকে। ধর্মের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল দেশপ্রেম। চিরাচরিত সাংস্কৃতিক কাঠামোতে খাপ খেয়ে গিয়েছিল মেয়েদের রাজনীতিকরণ।"[৮৫]

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু হাওয়া এবং বিমলার মধ্যে 'প্রাণশক্তি'র আবিষ্কার *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে বিধৃত।

সন্দীপ যে বিমলাকে তার প্রতি আকর্ষিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত সচেতনভাবে স্বদেশী উন্মাদনার ব্যবহার করেছ, ইতিপূর্বে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। সন্দীপ চেয়েছে তার রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে বিমলাকে মিলিয়ে দিতে - "বিমলাকে যে ছাড়তে পারব এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখছি নে। তাই বলে নিজের পথটাও আমি ছাড়তে পারব না। ... আমি আমার স্বদেশকে ছাড়তে পারব না, বিশেষত আজকের দিনে; বিমলাকে আজ আমি আমার স্বদেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেব। যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশলক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোমটা খুলবে - সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাকবে না। জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলবে তরী, উড়বে তাতে 'বন্দেমাতরং' জয়পতাকা, চারিদিকে গর্জন আর ফেনা - সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা।" স্বদেশী নেতা সন্দীপের রাজনীতির মূল কথাই হল ফল লাভ - এই ফল লাভের জন্য সে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তার কাছে পথটা মুখ্য নয়, লক্ষ্যটাই মূল। সন্দীপের এই রাজনৈতিক দর্শন তার জীবনদর্শনে মূলিভূত। একারণেই দেশের প্রশ্নে যেমন, বিমলাকে লাভ করার প্রশ্নেও সে ন্যায়-অন্যায়ের নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব দিতে নারাজ। তার এই জীবনদর্শনের প্রেরণাভূমি যে ইয়োরোপের ভোগবাদী বস্তুসর্বস্ব দর্শন, তার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। সন্দীপ তার এই ভোগবাদী জীবনদর্শনের পরিচয় বিভিন্ন প্রসঙ্গে দিয়েছে -

**ক.** "প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে। তাই আধমরা তপস্বীদের হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্তফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না। ... এই-যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী।... আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা

নেই, পেতে আমার সংকোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মতো একেবারে পাতলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চাঁ-চাঁ গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পৌঁছবে না।"

**খ.** "আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতেই ছাড়ব না - মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটোবে, হাওয়ায় উড়বে...।"

ইয়োরোপের ভোগবাদী এই দর্শন থেকে সন্দীপ তার জীবনদর্শনের প্রেরণামূল সংগ্রহ করেছে। ইয়োরোপীয় নেশনতত্ত্ব ও তাদের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ সকল প্রকার নীতি-নিয়ম জলাঞ্জলি দিয়ে কিভাবে তার নখ-দন্ত প্রকাশ করে তার বিশ্লেষণে সন্দীপ অভ্রান্ত -

> "যারা রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য গড়েছে, সমাজ বেঁধেছে, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেছে, তারাই তোমাদের (নিখিলেশের) বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এসেছে। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যাকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যই সত্যের লোহার শিকল। তোমরা কি ইতিহাস পড় নি? তোমরা কি জান না, পৃথিবীর বড়ো বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে মসলাগুলো সব মিথ্যে! ... তারা রাষ্ট্রনীতির সদর-খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসেব লেখে, তাদের খবরের কাগজ মিথ্যার বোঝাই জাহাজ, আর মাছি যেমন করে সান্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে তাদের ধর্মপ্রচারকেরা তেমনি করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য।" (নিখিলেশের আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়)

পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই মিথ্যার বেসাতি আজকের উন্নত ধনতন্ত্রের যুগে যেন আরও বেশি মাত্রায় ক্রিয়াশীল। এই শক্তিই নারীমুক্তির মিথ্যায় নারীকে পণ্য বানায়।

নারীস্বাধীনতার ছদ্মবেশে নারীকে পণ্য বানানোর ভোগবাদী চক্রান্ত সন্দীপের অবলম্বিত পথে লক্ষ্য করা যায় - "আমি নিজের মুখে ওকে (বিমলা) বেশি কিছু বলব না, এখনকার কালের কতকগুলো ইংরেজি বই ওকে পড়তে দেব। ও ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারুক যে, প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডারন্। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডারন্ নয়। মডারন্ এই কথাটার যদি আশ্রয় পায় তা হলেই ও জোর পাবে; কেননা ওদের তীর্থ চাই, গুরুঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই, শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।" (সন্দীপের আত্মকথা - দ্বিতীয় পর্যায়)

সার্বিক এই পণ্যায়নের যুগে উন্নত ধনতন্ত্রের সুচতুর কৌশলে নারীমুক্তির ছদ্মবেশে নারীও যখন আজ 'সস্তা দামে বিকোবার' পণ্যে পরিণত হচ্ছে, তখন সন্দীপের অবলম্বিত এই পথ নারীচেতনাবাদী পাঠে মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে। সন্দীপের স্তুতিবাদে আচ্ছন্ন হয়ে বিমলা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সন্দীপের প্রদর্শিত পথ যা আপাতদৃষ্টিতে মুক্তির পথ বলে মনে হয়, তা যে প্রকৃতপক্ষে পণ্যায়নের মধ্যদিয়ে নারীকে এক খাঁচা থেকে বের করে অপর এক খাঁচায় বন্দি করার কৌশল, সন্দীপের অবলম্বিত পথের পুনঃপাঠে এমন পাঠ উঠে আসা অমূলক নয়। বিশেষত বিমলার উপলব্ধিতে যখন আজকের নারীচেতনাবাদের চিন্তাসূত্র উচ্চারিত - "আমাকে স্তব কোরো না, সেইটেই মিথ্যা।" (বিমলার আত্মকথা - ষষ্ঠ পর্যায়)

ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত স্থূল বস্তুতন্ত্র আদর্শ করে সন্দীপ যদিও বলেছে 'ধর্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্বল করে দেয়,' এবং নীতিবহির্ভূত ভাবে ফল লাভটাই তার কাছে মুখ্য, তবুও চেতনার গভীর স্তরে সে যে ভারতীয় সাত্ত্বিকতার বীজ লালনকারী - তা তার আত্মকথায় স্বীকৃত। আর এ-কারণেই 'এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ত্ব করে ফেলে দেব তবে ছাড়ব, এই আমার স্বভাব,' - সন্দীপ নিজের স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য জানালেও বিমলার ক্ষেত্রে এই স্বভাব সে বজায় রাখতে পারে নি। বিমলার সাথে তার একান্ত আলাপচারিতার মুহূর্তে মূর্তিমান রসভঙ্গ চন্দ্রনাথবাবুর

আবির্ভাব ঘটলে সন্দীপ বিরক্ত হলেও অনুভব করেছে - "আমাদের সকলের ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন দুর্বৃত্ত, আমিও কেমন থমকে গেলুম।" সন্দীপ খল প্রকৃতির হলেও সে যে নির্ভেজাল দুর্বৃত্ত নয়, তা সে নিজেই উপলব্ধি করেছে। তার তৃতীয় পর্যায়ের আত্মকথায় সে বলেছে -

**ক.** "আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনই দগ্ধ না করে তখনই ছাই হয়ে যায়। যখনই কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয়, তখনই পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি। কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া, এ পুরোপুরি আমি নয়। যতই অন্যায়ের বড়াই করি না কেন, আইডিয়ার উড়ুনির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে - সে নেহাত কাঁচা, অতি নরম। তার কারণ, আমার অধিকাংশ আমার পূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে।"

**খ.** "... একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই, জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়।"

**গ.** "কোনো-এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখতেন তা হলে নিশ্চয় দেখা যেত আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাত নেই - এমন-কি, ঐ নিখিলেশের সঙ্গে। ... পণ করেছিলুম নিজের হাতে বা পরের হাতে গড়া কোনো মায়াকেই জীবনের মধ্যে স্থান দেব না, জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুলব। কিন্তু তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনটাকে কী দেখছি? কোথায় সেই ঠাস-বুনোনি? এ যে জালের মতো; সূত্র বরাবর চলেছে, কিন্তু সূত্র যতখানি ফাঁক তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। এই ফাঁকটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না।"

**ঘ.** "দেখছি বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মতো ছট্‌ফট্ করছে; তার বড়ো বড়ো দুই চোখে কত ভয় কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত - ব্যাধ তো এই দেখে খুশি হয়। আমার খুশি আছে, কিন্তু ব্যথাও আছে। সেইজন্যে কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে, তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারছি নে।"

সন্দীপ নির্ভেজাল দুর্বৃত্ত নয় বলেই এবং নিজের স্বভাবের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকার জন্যেই সান্ত্বনার ছলে বিমলার হাত চেপে ধরলে তার দেহে-মনে তরঙ্গের সৃষ্টি হলেও এর বেশি সে এগোতে পারে নি। ইচ্ছা এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন পারে নি, তার বিশ্লেষণও নিজের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সন্দীপ করেছে,

> "আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝংকার দিয়ে উঠল; কিন্তু ঐ অস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল, অন্তরা পর্যন্ত কেন পৌঁছল না? বুঝতে পারলুম জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে; ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়। ভিতরে একটা সংকোচ কোথাও রয়ে গেছে, সেটা কী? সে কোনো একটা জিনিস নয়, সে অনেকগুলোতে জড়ানো। সেইজন্য তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারি নে, এই কেবল বুঝি, আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না।"
> (সন্দীপের আত্মকথা - চতুর্থ পর্যায়)

সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে এই সাত্ত্বিকতার গোপন উপস্থিতি (যা তার চোখে দুর্বলতা বলে প্রতিভাত) থাকার জন্যই বিমলার চরম সর্বনাশ সে করতে পারে নি। যেটা ঘটলে নিখিলেশের কাছে বিমলার প্রত্যাবর্তন বিমলার দিক দিয়ে এতটা সহজ হত না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা দূরসঞ্চারী হলেও কতিপয় মৌল ভ্রান্তির জন্য এই আন্দোলন প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। পরবর্তী ইতিহাসে এই আন্দোলনের নেতিবাচক প্রভাব সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় প্রমাণিত, যার কিছুটা উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। *ঘরে-বাইরে* যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, সে সময় বুড়ী-বালামের তীরে (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) রচিত হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আত্মত্যাগের এক স্বর্ণালি অধ্যায়। এক দশক আগের স্বদেশী নেতা সন্দীপের মধ্যদিয়ে স্বদেশী নেতার বিকৃতি স্মৃতিমেদুর সমকালীন পাঠকসমাজকে

তাই আহত করেছিল। এই প্রতিক্রিয়া আজও বহমান। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে অসংখ্য দেশসেবকের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ যেমন ঐতিহাসিক সত্য, সন্দীপ যে সকল পন্থা অবলম্বন করেছে, স্বদেশী আন্দোলনে সেগুলোর ব্যবহারও ঐতিহাসিক সত্য। এক্ষেত্রে আমাদের ধরণা, স্বদেশী ও তার পরবর্তী সময়ে যে সকল বীর সেনানী জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগ করেছিলেন সেদিন, বয়কটকেই সফল করার সাময়িক উন্মাদনায় তাদের অবলম্বিত পথ ভবিষ্যত ইতিহাসের বুকে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করছে কি না সেদিকে সচেতন ছিলেন না হয়তো, অমূল্য যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ক্ষুদিরাম বোস যে বয়সে শহিদ হন, সেই বয়সে রাজনৈতিক সচেতনতা কতটা জাগতে পারে, তাঁর আত্মত্যাগের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেও এই প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। অপরদিকে সন্দীপ যা ভেবেছে - যা করেছে এবং করতে চেয়েছে, সবই অত্যন্ত সচেতন ভাবে। সে শুধু ভগবানকেই নয়, ইতিহাসকেও নিজের মত করে সৃষ্টি করতে চেয়েছে। আর এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে আত্মকথার রীতিতে উপন্যাসটি রচিত হওয়ায়। সন্দীপ চরিত্র পরিকল্পনা অনেককে আহত করলেও আমাদের মনে হয় সন্দীপ চরিত্র উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রতিবন্ধক নয়, কেননা রবীন্দ্রনাথ তো ঘরে-বাইরেতে স্বদেশী আন্দোলনের কোনো ঐতিহাসিক প্রতিবেদন লিখতে চান নি, তিনি চেয়েছিলেন উপন্যাস লিখতে।

**৬.৪.২.২. নিখিলেশের অবস্থান** -

রাজনৈতিক মুক্তি ও ব্যক্তিমুক্তির প্রশ্নে নিখিলেশের অবস্থান সন্দীপের বিপরীত মেরুতে। নিখিলেশের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা কিভাবে শিল্পরূপ পেয়েছে ইতিপূর্বে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। বস্তুত যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে নিখিলেশ দেশের চিত্তশক্তি জাগাতে চেয়েছে, সেই একই চিন্তাধারা থেকে সে বিমলার মধ্যদিয়ে ব্যক্তিমুক্তি দেখতে চেয়েছে। পরিবর্তিত বিমলা ইতিহাসের যে উল্লম্ফন লক্ষ্য করেছিল, সেদিনের স্বদেশীর উন্মাদনায় অপ্রস্তুত সমাজের যোগদানের ফলে সৃষ্ট অসঙ্গতি সম্পর্কে নিখিলেশ প্রথমাবধি সচেতন ছিল। ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন -

"... ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার নিয়ে উন্নাসিকতা স্বদেশীর কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েই ছিল এক সময়ে; 'পন্থা পরিণামের পরিমাপক, না পরিণামই পন্থার', এ-সব প্রশ্ন তো ঐকাল থেকেই বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। অন্যপক্ষে স্বদেশীর পরিণাম হিশেবে মুক্তির যে ছক কাটা হয়েছিল, তাও ছিল অস্পষ্ট। আসলে স্বদেশীর ঝড়টাও তো ছিল বাঙালির ইতিহাসে 'পড়ে পাওয়া ধন', বিনামূল্যের মস্ত পুঁজি। তাকে কাজে লাগানোর ঝোঁকটা যত প্রবল ছিল, তার পন্থা-প্রকরণের ধরাণা তেমন স্বচ্ছ ছিল না।"[৮৬]

সেদিনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অপ্রস্তুত সমাজের কাছে স্বদেশী যে ছিল পড়ে পাওয়া ধনের মতই, নিখিলেশের দৃষ্টিতে তা সেদিন স্পষ্ট ছিল। এক্ষেত্রে যে প্রবর্তনা থেকে নিখিলেশ দেশবাসীর আত্মিক জগরণ চেয়েছে, সেই একই প্রবর্তনা থেকে চেয়েছে নারীমুক্তি। এদিক থেকে নিখিলেশের স্বদেশ চিন্তা ও ব্যক্তিমুক্তির চিন্তা একই উৎসজাত।

নিখিলেশ তার প্রকৃতিকে রূপকের আবরণে ব্যক্ত করেছে - "ডিমের ভিতরকার পাখি যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিস বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো - তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।" (সন্দীপের আত্মকথা - প্রথম পর্যায়) এই চেতনা থেকে নিখিলেশ সেদিনের স্বদেশীর উন্মাদনার দিনেও যেমন তার বিকল্প মতাদর্শে অটল থেকেছে, বিমলার প্রশ্নেও তেমনি দৃঢ় থাকতে পেরেছে। অথচ নিখিলেশের চরিত্রের এই দৃঢ়তাকে দুর্বলতা ভেবে অনেকেই নিখিলেশকে নির্জীব বলে মনে করেছেন, যা উপন্যাসের শিল্পরূপের ক্ষেত্রে ত্রুটি বলে তাঁদের কাছে বিবেচিত হয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন -

"নিখিলেশের অবিমিশ্র আদর্শবাদ তাহার ব্যক্তিত্বকে শীর্ণ ও ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। অবশ্য লেখকের দিক হইতে বলা যাইতে পারে যে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, নিখিলেশের চরিত্রে তিনি রক্ত-মাংসের আধিক্য ইচ্ছাপূর্বকই বর্জন করিয়াছিলেন।... উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যদি কোন আদর্শবাদের প্রবর্তন হয়, তবে তাহাকে অশরীরী ছায়ামূর্তী করিয়া রাখিলে চলিবে না,

তাহাকে রক্তমাংসসমন্বিত প্রাণাবেগ-চঞ্চল করিয়া দেখাইতে হইবে। নিখিলেশের ক্ষেত্রে পাঠকের এই সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত দাবি রক্ষিত হয় নাই।"[৮৭]

নিখিলেশ সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন নীহাররঞ্জন রায়, রথীন্দ্রনাথ রায় প্রমূখ সমালোচকেরা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিখিলেশকে 'মতবাদের প্রতীক ব্যতীত স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ' বলে মনে করতে পারেন নি। বিমলাকে বাইরের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দাম্পত্যকে সর্বাঙ্গিণ সুন্দর করে তোলার উদ্দেশ্যে নিখিলেশের পরীক্ষায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন - 'নিখিলেশ নিজে যাচিয়া এই পরীক্ষার প্রস্তাব করিয়াছে, কিন্তু পরীক্ষার আরম্ভমাত্রেই তাহার অন্তরের প্রেমিক-পুরুষ হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে'।[৮৮] এখানে প্রশ্ন জাগে স্বেচ্ছাকৃত পরীক্ষার সূচনা থেকেই যে প্রেমিক-পুরুষটির হৃদয় হতাশার দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত হয়, তাকে রক্ত-মাংসহীন অশরীরী ছায়ামূর্তি বা নিছক 'মতবাদের প্রতীক' বলা যায় কি!

দাম্পত্যকে নিখিলেশ কোন চোখে দেখত, তা বোঝা যায় তার আত্মসমীক্ষা থেকে - "দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস, সে তো কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসার যাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ।" দাম্পত্য সম্পর্কে যার চিন্তাধারা এত উন্নত, এত আধুনিক, সেই ব্যক্তিই বলতে পারে 'আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো'। এই ব্যক্তিই যখন 'একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখ-দুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত' উপলব্ধি করে এবং এই বিশ্বাসে ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ বেদনার উপশম খোঁজে, তখন তাকে নিষ্ক্রিয় বা নির্লিপ্ত বলা যায় না, বরং তার মধ্যে আধুনিক মানুষের এক ভিন্ন মাত্রা পরিলক্ষিত হয়, যে মানুষ আত্মসর্বস্ব নয়। নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে দেখেও নিখিলেশ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে, যা তার গভীর চিৎশক্তির পরিচায়ক, নিষ্ক্রিয়তার নয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা না করে জোর জবরদস্তি করলে অনেক সমালোচকের কাছে তার পৌরুষ প্রকাশ পেত হয়তো, কিন্তু মুহূর্তে ধ্বস্ত হত নিখিলেশের প্রকৃতিসংলগ্ন আধুনিকতার মাত্রাটি।

সন্দীপ নিখিলেশের ঘরে ও বাইরে অনেক আলোড়ন তুললেও এবং অনেক ক্ষতি করলেও নিখিলেশ যে তাকে তাড়িয়ে দেয় নি, তার পেছনে তার ব্যক্তিত্বের যে দিকটি ক্রিয়াশীল থেকেছে, তা একাধারে তার ব্যক্তিবোধ ও রাজনৈতিক বোধের ধাত্রীভূমি। সন্দীপকে চলে যাওয়ার কথা বলতে না পারার কারণ হিসেবে নিখিলেশ জানিয়েছে - "কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছি সন্দীপের দলবল আমাদের অঞ্চলে উৎপাত শুরু করেছে। যদি আমার স্বভাবে স্থির থাকতুম তাহলে সন্দীপকে জোরের সঙ্গে বলতুম, এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু গোলেমালে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। আমার পথ আর সরল নেই। সন্দীপকে চলে যেতে বলার মধ্যে আমার একটা লজ্জা আসে। ওর সঙ্গে আর একটা কথা এসে পড়ে; তাতে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যাই।" (নিখিলেশের আত্মকথা - ষষ্ঠ পর্যায়) অর্থাৎ নিখিলেশ যদি তার 'স্বভাবে স্থির' থাকতে পারতো, তবে সে সন্দীপকে চলে যেতে বলতে পারত, তার মানে নিখিলেশের স্বভাবে নিষ্ক্রিয়তা নেই। পারে নি, কেননা 'গোলেমালে অস্বাভাবিক' হয়ে উঠেছে বলে তার 'পথ আর সরল নেই'। কি এই গোলমাল, যা নিখিলেশের মতো গভীর ধৈর্যশীল মানুষকেও অস্বাভাবিক করে দিয়েছে! এ কি শুধুই সন্দীপের দলবলের উৎপাত-জনিত গোলমাল, না কি সন্দীপের দ্বারা অন্তঃপুর ধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার গোলমাল, না কি দুটো মিলিয়েই। 'অতিথি দেব ভবঃ' এই ভারতীয় সংস্কার নিখিলেশের মনে প্রোথিত থাকায় সন্দীপকে চলে যেতে বলার পেছনে তার 'একটা লজ্জা আসে'। কিন্তু নিখিলেশ আরও জানিয়েছে, 'ওর সঙ্গে আর একটা কথা এসে পড়ে; তাতে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যাই'। এই ছোটো হয়ে যাওয়া কি নিজের কাছে নিজের পরাজয়ের দিকেই ইঙ্গিত করে! যে নিখিলেশ চেয়েছিল বিমলা বাইরে বেরিয়ে আসুক, সেই বিমলাই যখন বাইরে ডানা মেলে দিল, তখন বিমলাকে হারাবার আশঙ্কায় বাইরেটাকেই বিমলার থেকে ছেটে দিয়ে নিখিলেশ বিমলাকে জিততে চায় নি। এই আশঙ্কাতেই কি নিখিলেশ সন্দীপকে তাড়াবার প্রশ্নে শুধু লজ্জিত নয়, নিজের কাছে ছোটো হয়ে গেছে। কেননা দাম্পত্য নিখিলেশের কাছে কেবলমাত্র 'গৃহস্থ আশ্রম বা সংসারযাত্রা' নয়, দাম্পত্য নিখিলেশের কাছে 'জীবনের বিকাশ'। জীবনের বিকাশের সহযোগী সত্তা বিমলাকে তার স্বপ্নের ঘোরের মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে এনে নিজের বিকাশ নিখিলেশ চায় নি বলেই নিজের

বাইরেকে ঠেকাতে গিয়ে নিজের ভিতরকে ঠকাতে চায় নি। তার নিজের ভাষায় - 'কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কী করে?'

অথচ এই নিখিলেশই অকপটে সন্দীপকে চলে যেতে বলেছে। না গেলে বল প্রয়োগের ইঙ্গিতও দিয়েছে। এই চলে যেতে বলার পেছনে শুধুই কি মুসলমান প্রজাদের দ্বারা সন্দীপের প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা ক্রিয়াশীল? আমাদের ধারণা, তা নয়। নিখিলেশ অপেক্ষা করেছে বিমলার পরিণতির জন্য। সন্দীপের মোহ থেকে বিমলা যতদিন না মুক্ত হতে পেরেছে, নিজের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ বুকে নিয়েও নিখিলেশ ততদিন সন্দীপের উপস্থিতি সহ্য করেছে। যে সন্দীপ একাধারে তার রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধী এবং ব্যক্তিমুক্তির প্রশ্নেও ভিন্ন মতাবলম্বী। অবশেষে যে রাতে নিখিলেশ সন্দীপের স্তব-মুক্ত, সন্দীপের মোহ মুক্ত অজস্র কান্নার ধারায় পরিস্রুত বিমলাকে ফিরে পেয়েছে, তার পর থেকে সন্দীপের আর প্রয়োজন থাকে নি। কারণ ততদিনে মুসলমান প্রজাদের বিদ্রোহ ও সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতায় সন্দীপের রাজনীতির ভ্রান্তনীতি যেমন প্রমাণিত হয়েছে, বিমলার কাছেও তার প্রকৃত রূপ অনাবৃত হয়ে পড়েছে। এর পর আর সন্দীপের প্রয়োজন থাকতে পারে না। সন্দীপ নিজেও এটা উপলব্ধি করেছিল - "অদ্ভুত মানুষ ওই নিখিলেশ। ও বেশ বুঝেছে ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তবু আমাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেয় না কেন? আমি জানি, ও অপেক্ষা করে আছে বিমল কি করে।" এটা না করে, বিমলার মোহমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সন্দীপকে তাড়ালে হয়তো বিমলারও পরিণতি হতে পারতো *পয়লা নম্বর* গল্পের অনিলার মতো। যে তার স্বামীর সংসারেও থাকতে পারে নি, আবার তার অনুরাগীর সাথেও মিলিত হতে পারে নি। দুজনের থকেই দূরে সরে গিয়ে যাকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। যদিও বিমলা ও অনিলা এক নয়।

পরিবর্তিত বিমলা নিখিলেশের প্রেমের গভীরতাই কেবলমাত্র উপলব্ধি করে নি, নিখিলেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারার অভ্রান্ততাও উপলব্ধি করেছে। অন্তত সেদিনের স্বদেশীর উন্মাদনা যে

সমাজেতিহাসের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশজনিত নয়, সেটা বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে ইতিহাস কোনো বাহন ছাড়া 'পুষ্পক রথের মত' আপনি চলে আসতে পারে না। 'অন্তত তার মাতলিকে' 'মাশুল' ও 'খোরাকি' দিতে হয়। আর এখানেই ঘরে-বাইরে উপন্যাসে রাজনৈতিক মুক্তি ও ব্যক্তিমুক্তির চিন্তা এক বিন্দুতে এসে মিলে যায়। ভারতে নারীর অবস্থান পর্যালোচনার জন্য স্থাপিত জাতীয় আয়োগ (National Committee on the Status of Women - 1971) তাদের প্রতিবেদনে প্রথম পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করে -

> "Equality of women is necessary not merely on the grounds of social justice, but as a basic condition for the social, economic, and political development of the nation."[৮৯]

জাতীয় উন্নতিতে নারীর ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নিখিলেশ উপলব্ধি করেছিল হয়তো। অন্তত বিমলা ও নিখিলেশের সংলাপ সেদিকেই ইঙ্গিত করে -

> "আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছা ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বললুম, বাইরেতে আমার দরকার কী?
>
> তিনি বললেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।"

---

**নির্দেশিকা ঃ-**

১. রায়, রথীন্দ্রনাথ ঃ *রবীন্দ্র-মনন*, কলকাতা ঃ ১৯৮৭, পৃঃ ৭৪ - ৭৫

২. মজুমদার, নেপাল ঃ *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৯৯৫, পৃঃ ৩৮৫

৩. হোসেন, সৈয়দ আকরম ঃ *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, কলকাতা ঃ ২০১১, পৃঃ ২৩৩

৪. মজুমদার, নেপাল ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ VII

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ঃ *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৭৮, পৃঃ ৮০

৬. হালদার, গোপাল ঃ "রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা"। *রবীন্দ্রনাথ - শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন*, কলকাতা ঃ ১৯৯৮, পৃঃ ৯৮ - ৯৯

৭. সরকার, সুশোভন ঃ *রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা ঃ ২০০২, পৃঃ ৪৭ - ৪৮

৮. তদেব, পৃঃ ৫০

৯. তদেব, পৃঃ ৫৫

১০. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ ঃ *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা ঃ ১৪১১, পৃঃ ১১৬

১১. হোসেন, সৈয়দ আকরম ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৯

১২. সিকদার, অশ্রুকুমার ঃ *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা ঃ ১৩৯৫, পৃঃ ১১

১৩. দ্রঃ "গ্রন্থপরিচয়"। *ঘরে-বাইরে*, রবীন্দ্র-উপন্যাস সংগ্রহ, কলকাতা ঃ ১৪০৪, পৃঃ ১২৯৯

১৪. চৌধুরী, বিশ্বপতি ঃ *কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা ঃ ১৩৭১, পৃঃ ৮৬

১৫. চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র ঃ ঘরে-বাইরে, প্রবাসী - ১৩২৬, কলকাতা, পৃঃ ২৭২ - ৭৭

১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭

১৭. "গ্রন্থপরিচয়"। *ঘরে-বাইরে*, পৃঃ ১২৯৪

১৮. ঐ, পৃঃ ১২৯৫

১৯. ঐ, পৃঃ ১২৯৫

২০. *সভাপতির অভিভাষণ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৫২১

২১. ঐ, পৃঃ ৫২০ - ২১

২২. হালদার, গোপাল ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮

২৩. *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৫, পৃঃ ৩৪৮

২৪. দ্রঃ অবতরণিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯০

২৫. দ্রঃ "গ্রন্থপরিচয়"। *জীবনস্মৃতি*

২৬. "এবার ফিরাও মোরে"। *চিত্রা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৩২

২৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ঃ *রবীন্দ্রজীবনকথা*, কলকাতা ঃ ১৪০১, পৃঃ ৬৫

২৮. "অবস্থা ও ব্যবস্থা"। *আত্মশক্তি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতাঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৬০২

২৯. ঘোষ, বিনয় ঃ *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা ঃ ২০০৭, পৃঃ ২০

৩০. তদেব, পৃঃ ২১

৩১. রায়, অনুরাধা ঃ "বিশ শতকের বাংলাঃ কৃষক আন্দোলন"। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, কলকাতা ঃ ২০১০, পৃঃ ২২৭

৩২. সেন, অজয় ঃ "স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙালি সমাজ"। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পৃঃ ৪৬

৩৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ঃ *ভারতে জাতীয় আন্দোলন*, কলকাতা ঃ ১৯৬৫, পৃঃ ৯৭ - ৮

৩৪. "সদুপায়"। *সমূহ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৫২৪

৩৫. ঐ, পৃঃ ৫২৭ - ৮

৩৬. সেনগুপ্ত, বাঁধন ঃ *সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রচিন্তা*, কলকাতা ঃ ২০১১, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৮৮

৩৭. "পথ ও পাথেয়"। *রাজা প্রজা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৪৪৫

৩৮. "সদুপায়"। *সমূহ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৫২৮

৩৯. "ব্যাধি ও প্রতিকার"। *সমূহ* (পরিশিষ্ট),ঐ, পৃঃ ৬২৯ - ৩০

৪০. "সত্যের আহ্বান"। *কালান্তর*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৩৩৬

৪১. "সদুপায়"। *সমূহ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৫২৭

৪২. "শেষ কথা"। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ২৪৫ - ৪৬

৪৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ঃ *রবীন্দ্রজীবনকথা*, কলকাতা ঃ ১৪০১, পৃঃ ৬৭

৪৪. মজুমদার, লীলাঃ "আর কোনোখানে"। *অমৃতলোক - ১০৪* (নারীবিশ্ব বিশেষ সংখ্যা)। সম্পাঃ সমীরণ মজুমদার, মেদিনীপুর ঃ ২০০৫, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১২৫ - ২৬

৪৫. তদেব, পৃঃ ২৬

৪৬. *পল্লীপ্রকৃতি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৫৩১

৪৭. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি*, কলকাতা ঃ ১৪১৪, পৃঃ ১১৬

৪৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার ঃ *রবীন্দ্রনাথ ঃ পল্লীপুনর্গঠন*, কলকাতা ঃ ১৯৯৭, পৃঃ ৩৭

৪৯. সুত্র। ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১

৫০. মজুমদার, বিমানবিহারী ঃ "ভারতের কৃষক ও শ্রমিক"। *দেশ* সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ-সংকলন। সম্পাঃ সাগরময় ঘোষ, কলকাতা ঃ ২০০৪, পৃঃ ৫৩ - ৫৪

৫১. "আভাস"। *চার অধ্যায়*, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-উপন্যাস সংগ্রহ, কলকাতা ঃ ১৪০৪, পৃঃ ১৩০৫

৫২. "ব্যাধি ও প্রতিকার"। *সমূহ* (পরিশিষ্ট), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২৮

৫৩. "সদুপায়"। *সমূহ* (পরিশিষ্ট), ঐ, পৃঃ ৫২৩

৫৪. "হিন্দু-মুসলমান"। *কালান্তর*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৪৫০

৫৫. রায়, অনুরাধা ঃ প্রাগুক্ত, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৩৩

৫৬. "ছোটো ও বড়ো"। *কালান্তর*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ২৭৫

৫৭. কর, শিশির ঃ *বিপ্লব আন্দোলনের নেপথ্যে নানা কাহিনী*, আনন্দ, কলকাতা ঃ ১৯৯২, পৃঃ ৫৫

৫৮. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ঃ প্রাগুক্ত, কলকাতা ঃ ১৯৬৫, পৃঃ ২৪১

৫৯. মজুমদার, নেপাল ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৩

৬০. 'Nationalism in the west'. *Nationalism*, p. 16

৬১. ৬৪ সংখ্যক কবিতা, *নৈবেদ্য*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৭১

৬২. "দেশের কথা"। *সমূহ* (পরিশিষ্ট), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২২

৬৩. "সদুপায়"। *সমূহ*, ঐ, পৃঃ ৫২৮

৬৪. "পথ ও পাথেয়"। *রাজা প্রজা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৪৪৬

৬৫. ঘোষ, বিনয় ঃ *বাংলার নবজাগৃতি*, কলকাতা ঃ ১৩৯১, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৫৬

৬৬. "পল্লীসেবা"। *পল্লীপ্রকৃতি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৫৭২

৬৭. "রায়তের কথা"। *কালান্তর*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৩

৬৮. "সত্যের আহ্বান"। *কালান্তর*, ঐ, পৃঃ ৩২৬

৬৯. রায়, অনুরাধা ঃ প্রাগুক্ত, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৪৫

৭০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ঃ *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা ঃ ১৩৮৭, পৃঃ ১৬৩

৭১. রায়, ভারতী ঃ *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা*, কলকাতা ঃ ২০১২, পৃঃ ৫৯

৭২. তদেব, পৃঃ ১০

৭৩. তদেব, পৃঃ ৫৯

৭৪. "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য"। *সমাজ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ২৪৫-৪৬

৭৫. "ল্যাবরেটরি"। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ২৭০ - ৭১

৭৬. *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯০, পৃঃ ৫৮৯

৭৭. "নরনারী"। *পঞ্চভূত*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৫৫৯

৭৮. ঐ, পৃঃ ৫৫৮ - ৫৯

৭৯. বসু, নিমাইসাধন ঃ "স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালি"। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পৃঃ ১০৪

৮০. ভট্টাচার্য, সুকুমারী ঃ *মন্থন*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ঃ ২০০০, পৃঃ ১০৪

৮১. বলাকা, ভাদ্র - ১৩৬২ (সুতপা ভট্টাচার্য, *মেয়েদের লেখালেখি*, কলকাতা ঃ ২০০৪, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১১১)

৮২. ভট্টাচার্য, সুকুমারী ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯ - ১০

৮৩. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ ঃ *রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প*, কলকাতা ঃ ১৯৮৪, পৃঃ ৩১

৮৪. স্মরণীয় ঘরে-বাইরে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য - 'মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাইরের, একের সঙ্গে অন্যের ঘাত-প্রতিঘাতে যে হাসিকান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এর মধ্যে তারই বর্ণনা আছে। তার চেয়ে বেশি যদি কিছু থাকে সেটা অবান্তর এবং আকস্মিক।' গ্রন্থপরিচয়, *ঘরে-বাইরে*, রবীন্দ্র-উপন্যাস সংগ্রহ, কলকাতা ঃ ১৪০৪, পৃঃ ১২৯৯

৮৫. চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী ঃ "নারীশিক্ষা ও নারী বিদ্যাচর্চা"। *ইতিহাসে নারী ঃ শিক্ষা*। সম্পাঃ সুপর্ণা গুপ্ত, কলকাতা ঃ ২০০৯, পৃঃ ১৫৩

৮৬. চৌধুরী, ভূদেব ঃ *রবীন্দ্র-উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে*, কলকাতা ঃ ১৯৮৪, পৃঃ ৮৯

৮৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮

৮৮. তদেব, পৃঃ ১৬৬

৮৯. Atal, Yogesh. Changing Indian Society, Rawat Publication, Jaipur: 2006, P. 193